সকালবেলা
সাপ্তাহিকী
রবিবার সকালবেলা কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে
১৯ আগস্ট ২০১২

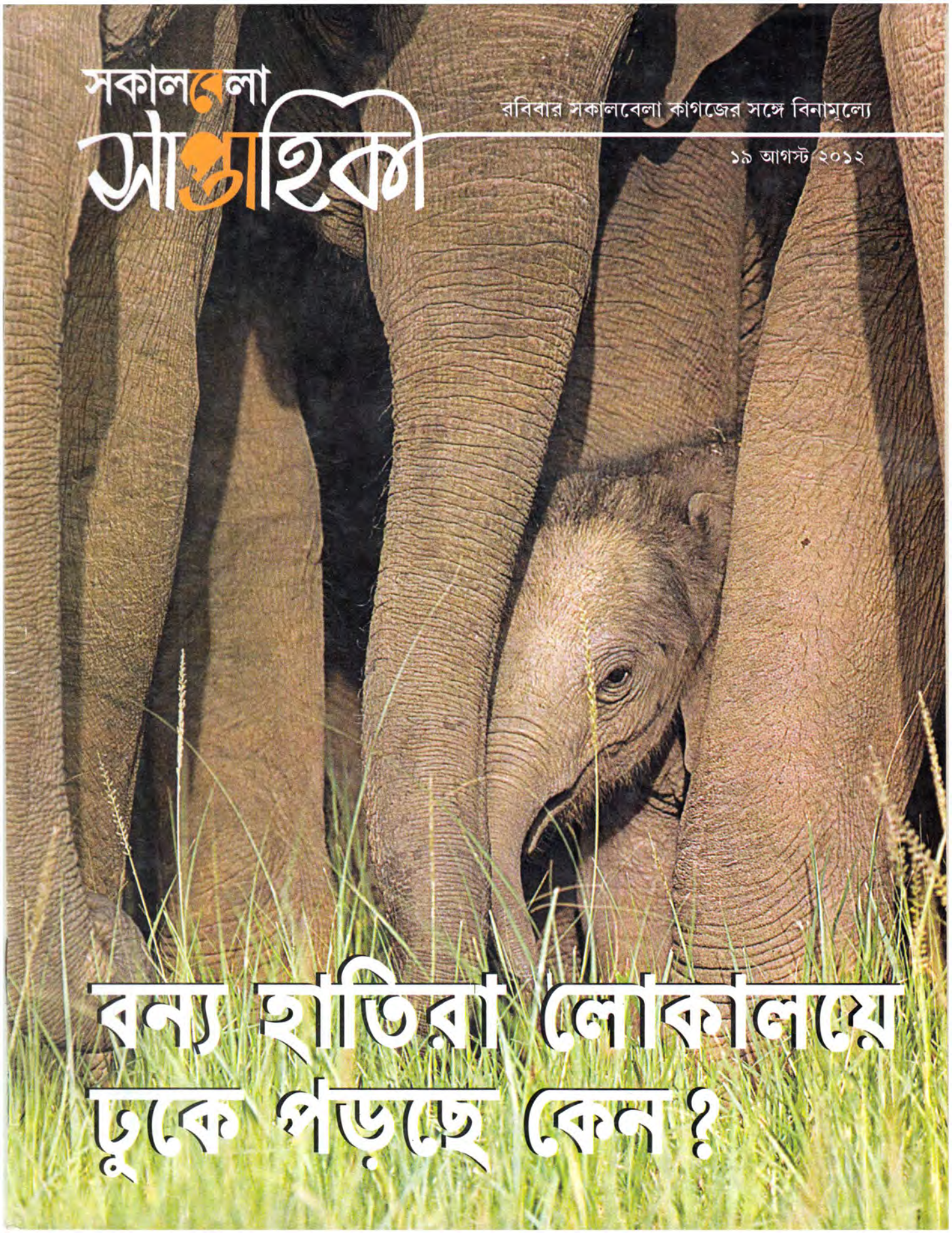

বন্য হাতিরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে কেন?

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

TEN TIMES WILDER THAN THE CONCRETE JUNGLE.

You haven't experienced the wild, till you've experienced Madhya Pradesh. With more than 20 wildlife sanctuaries and national parks, this single destination will give you what ten others put together can't: a million experiences.

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India

BORI
Sambhar

SANJAY DHUBRI
Panther

BANDHAVGARH
Tiger

SATPURA
Bear

KANHA
Barasingha

PENCH
Bison

CHAMBAL
Gangetic Dolphin

MADHYA PRADESH
Dus trip ke barabar ek trip

MADHAV
Chinkara

PANNA
Leopard

KEN
Gharial

MADHYA PRADESH TOURISM 'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855, e-mail - kolkata@mptourism.com

www.mptourism.com

ORM 9385

সকালবেলা সাপ্তাহিকী
১৯ আগস্ট ২০১২

SARADHA

সূচিপত্র

সাধুসঙ্গ
পুড্র শব্দের অর্থ তিলক বা ফোঁটা : **শিবশংকর ভারতী** ২

ধারাবাহিক উপন্যাস
টুটিলাওয়ার টাঁড়ে : **বুদ্ধদেব গুহ** ২২

গল্প
ও **অপর্ণা ভট্টাচার্য** ১৭

কবিতা
শ্যামলকান্তি দাশ, অংশুমান কর ৭
অর্ধিতা মণ্ডল, অনুপম মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনি
বন্য হাতিরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে কেন **দেবাশিস আইচ** ৮

বাইরে দূরে
ইন্টারেস্টিং বোরং : **সুচরিতা সেন চৌধুরি** ১৫

বিশেষ রচনা
বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল : **শিকুল ভট্টাচার্য** ২১

সিনেমা-টিভি-নাটক ৩৩

খেলা
ক্যাবিনেটের ফাঁকা জায়গাটায়
কী রাখবেন মহেশ? : **অভিরূপ দত্ত** ৩৮

নিয়মিত বিভাগ
বইপত্র-৪ চিত্র প্রদর্শনী-৬ সুস্থ থাকতে-২৬ রূপটান-২৫
কেনাকাটা-৩২ রেলসূচি ও উড়ানসূচি-২৮ ভূরিভোজ-৩০
ভাগ্য-৪০

সম্পাদক : সুদীপ্ত সেন
সাপ্তাহিকী সম্পাদক : কাকলি চক্রবর্তী

যোগাযোগ— সকালবেলা সাপ্তাহিকী, দ্য নলেজ হাব, ষষ্ঠ তল,
ডি এন ২৩, সেক্টর-৫ কলেজ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল— sakalbela.saptahiki@sakalbela.com

সাহিত্যম্ প্রকাশিত বুদ্ধদেব গুহ-র বই
ঋজু দা-র দুটি অনবদ্য উপন্যাস সংকলন

ঋজুদা দশটি ১ উপন্যাস ২০০

ঋজুদা দশটি ২ উপন্যাস ২০০

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ও গল্প সংকলন

সেরা দশটি উপন্যাস ৩০০

পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প ১৭৫

ছ'টি উপন্যাস ১৫০

বাবলি ৫০

চারুমতি ১০০

এছাড়া লেখকের অন্যান্য বই
সম্ ১৫০ | বাংরিপোসির দুরাত্তির ৪০ | বাসনা কুসুম ৫০
পামরি ৬০ | কুমুদিনী ৫০ | রাগমালা ৬০ | নগ্ননির্জন ৪০
বাতিঘর ৩০ | যুযুধান ৪০ | পরিযায়ী ৩০ | অন্য বনে ৪০
ইলকিনক ৩০ | ঋজুদার সঙ্গে সোঁদরবনে ৬০

সাহিত্যম 18বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-73, ফোন : 2241 9238, 4003, 3588
nirmalsahityam@gmail.com • www.nirmalsahityam.com

চার রঙের তিলক হয়। শ্যাম রঙের তিলকে শান্তি, লাল রঙের তিলকে বন্যতা, হলুদ রঙের তিলকে কল্যাণ আর সাদা বর্ণের তিলক মোক্ষের প্রতীক। এই রংগুলি এইসব গুণবাহী। তবে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তিলকস্বরূপ করতে হয়।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ তিলক বা ফোঁটা

শিবশংকর ভারতী

(২)

আমি সাধুবাবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, — বাবা, আপনি সাধুসন্ন্যাসীদের তিলকধারণের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র এবং ত্রিপুণ্ড্র কথাটি মাঝে মাঝেই ব্যবহার করেছেন। এই কথাগুলির ব্যাখ্যা কী?

একটু মুচকি হেসে সাধুবাবা বললেন,

— বেটা, পুণ্ড্র শব্দের অর্থ তিলক বা ফোঁটা। নাকের ডগা থেকে কপালের শেষ পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী যে তিলক, তাকে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র বলে। যেমন নারায়ণ, মর্যাদাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র, তিরুপতি বালাজির কপালের তিলক ঊর্ধ্বপুণ্ড্র। বাবা মহাদেবের বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গে চন্দনের তিনটি সামান্য ধনুকের মতো আড়াআড়ি করে আঁকা রেখাকে ত্রিপুণ্ড্র বলে। যারা শৈব, শিবের উপাসনা করে, তারা এই রকমের তিলক ধারণ করে। শক্তি সাধকেরা লাল রঙের ছোট্ট বিন্দু (কুমকুম, সিঁদুর) ভ্রু মধ্যে দিয়ে থাকে। ত্রিনয়নী দেবীমূর্তিতে এমন বিন্দুচিহ্ন থাকে।

কথাটা শেষ করতেই মনে পড়ে গেল কালীঘাটের মা কালীর কথা। সাধুবাবার বর্ণনা করা বিষয়টা মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। ততটা পরিষ্কারভাবে স্মৃতিতে এল না। ভাবলাম, বাড়িতে ফিরে ফোটো দেখে মিলিয়ে নেব। আমাকে এখন আর বেশি কথা বলতে হচ্ছে না। সাধুবাবাই বলে চলেছেন,

— দুটো ভ্রু-র সংযোগস্থল থেকে মাঝখানে খানিক ব্যবধান রাখতে হয়। এই ধরনের ঊর্ধ্বপুণ্ড্রকে বিষ্ণুমন্দির বা হরিমন্দির বলে। তিলকে আঁকা দুটি রেখার মাঝখানে অবস্থান করেন স্বয়ং নারায়ণ। বেটা, নারায়ণের অবস্থানের জন্যেই তিলকের দুটি রেখার মাঝে ফাঁক অর্থাৎ অন্তরাল রাখা হয়।

যখন কেউ কথা বলেন তখন তাঁর কথার মাঝে কথা বলতে নেই। কথার মাঝে কথা বললে কথার সুর, তাল ও লয় হারিয়ে যায়। কথার খেই থাকে না। প্রসঙ্গ হারিয়ে যায়। তাই সাধুবাবার কথায় আর কোনও প্রসঙ্গ টানলাম না। একটু থেমে কুম্ভমেলার চলমান যাত্রীদের ওপর একঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন,

— বেটা, জীবনে তোর মতো কেউ এমন বিষয় নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি কখনও। সকলের একটাই জিজ্ঞাসা সংসার নিয়ে। ছেলেপিলে, রোগ-ভোগ, স্বামী ও বিষয়সম্পত্তি ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন নেই। ভগবৎ প্রসঙ্গ তো নেই বললেই চলে।

এটুকু বলেই একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন,

— বেটা, সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করে

দেহের বিভিন্ন অংশে চন্দন দিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিত্র আঁকেন। ভগবান শঙ্করের উপাসক যাঁরা, তাঁরা কপালে সমান্তরালভাবে তিনটি রেখায় ধারণ করেন তিনটি তির্যক ত্রিপুণ্ড্র। এগুলি কেউ যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম, কেউ বা করে থাকেন গোপীচন্দন দিয়ে। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মধ্যে তুই হয়তো ঋষি জাবালির নাম শুনে থাকবি। ঋষি জাবালি বলেছেন, কপালে তিনটি রেখা অর্থাৎ ত্রিপুণ্ড্র মুক্তিদায়িনী গঙ্গার তিনটি স্রোতধারা। সেইজন্যই তো বাবা মহাদেবের উন্নত কপালে আঁকা থাকে তির্যক ত্রিপুণ্ড্র।

কথা শেষ হতেই জানতে চাইলাম,

— বাবা আপনি বললেন, 'মহাদেবের উন্নত কপাল'-এর কথা। আপনি কি মহাদেবের সূক্ষ্ম অথবা স্থূল দেহ দর্শন করেছেন? নইলে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা বললেন কেমন করে?

আমার এ কথায় এতটুকুও গুরুত্ব দিলেন না। আপনভাবেই বলে চললেন,

— বেটা, চার রঙের তিলক হয়। শ্যাম রঙের তিলকে শান্তি, লাল রঙের তিলকে বন্যতা, হলুদ রঙের তিলকে কল্যাণ আর সাদা বর্ণের তিলক মোক্ষের প্রতীক। এই রংগুলি এইসব গুণবাহী। তবে বেটা, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তিলকস্বরূপ করতে হয়। আঁকাবাঁকা করে, কপালে তিলক স্থাপনের নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে অত্যন্ত লম্বা অথবা খুব ছোট, ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে টেনে আঁকা তিলকের রেখা শুভ নয়। এমনটা ভগবৎ উপাসনা আর মনের উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থহীন, অস্বস্তিকর। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন বিশিষ্ট ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করলে ধারণকারী সকলের আদৃত ও প্রিয়পাত্র হয়, পুণ্যবানও হয়। ভগবান শঙ্করের উপাসকদের কপালে বাম থেকে ডান দিকে চিত্রিত থাকে ত্রিপুণ্ড্র। একেবারে উপরের অর্থাৎ কেশের কাছের রেখাটির নাম সাত্ত্বিকী। মাঝেরটির নাম রাজসী আর নিচের রেখাটির নাম তামসী।

সাধুবাবা একটু থামলেন। জানতে চাইলাম,

— ত্রিপুণ্ড্র চন্দন ছাড়া আর কোনওভাবে করা যেতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা নেড়ে সাধুবাবা বললেন,

— হাঁ বেটা, করা যায়। সেটা তো তোকে আগেই বলেছি। মাড়বার দেশে গিরনার নামে একটা পর্বত আছে। সেখানে গোরক্ষনাথ নামে এক সিদ্ধযোগী বাস করতেন। অনেক রাজা এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীনকে তিনি শিষ্য করেছিলেন। তিনি একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতেন উদাসীন শিষ্যদের জন্য। কান ফুটো করে একটি কুণ্ডল পরিয়ে দিতেন তাঁদের। কুণ্ডলগুলি পাথর, গন্ডারের শৃঙ্গ, মাটি এমনকী সোনারও হয়ে থাকে। এঁরা সারা গায়ে ভস্ম মাখেন, কপালে ত্রিপুণ্ড্র করে থাকেন ভস্ম দিয়ে। এরা শিবের উপাসক। কর্ণ-ফট্ (কানফাটা যোগী) যোগী নামে খ্যাত। এঁদেরই কেউ নাথ সম্প্রদায়, কেউ বা অতিথি সম্প্রদায়ের।

তিলকের মধ্যে যে এত কাণ্ড লুকিয়ে আছে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। যত শুনছি ততই মোহিত হয়ে যাচ্ছি। কুম্ভমেলায় আসাটা আমার সার্থক হয়েছে।

এবার তিলকধারণকারী প্রসঙ্গে সাধুবাবা বললেন,

— বেটা, তন্ত্রশাস্ত্রেও অঢেল প্রশংসা করা হয়েছে তিলকধারীদের। তন্ত্রশাস্ত্র প্রবক্তা ভগবান শঙ্কর বলেছেন, মর্তলোকে গঙ্গার মতো যত পুণ্যতোয়া স্রোতবতী তীর্থনদী আছে, সেই সব তীর্থনদীতে অবগাহনে যে ফললাভ হয়, যিনি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, সেই একই ফললাভ করে থাকেন তিনি।

এখানেই থামলেন না সাধুবাবা। একনজরে আমার কৌতূহলী আনন্দে ভরা মুখখানা দেখে নিয়ে বললেন,

— বেটা, গুরুপ্রদত্ত সাত কোটি মহামন্ত্র, সাত কোটি উপমন্ত্র, ভগবান শ্রীহরি ও সদানন্দ সদাশিবের কোটিমন্ত্র জপ করলে যে ফল পাওয়া যায়, কপালে যাঁর ত্রিপুণ্ড্র আছে, সেই ফল তিনি সহজে, অনায়াসে লাভ করে থাকেন। আগে শুধুমাত্র এই তিলক শিবের উপাসকরাই ধারণ করতেন। এর মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে এখন নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসী, উপাসক ভক্তরাও ধারণ করে থাকেন।

তিলক প্রসঙ্গেই আরও অনেক অ-নে-ক কথা হল। এবার জানতে চাইলাম,

— বাবা, তিলক তো হল। এবার বলুন না, সাধুসন্ন্যাসীরা একটুকরো কাপড়ের নিচে ছোট্ট একটা কৌপীন বা নেংটি পরেন কেন?

কথাটা শুনে সাধুবাবা একগাল হেসে ফেললেন। বললেন,

— বেটা, নেংটি বা কৌপীন ধারণ করা হয় ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য। সাধুসন্ন্যাসীরা যা কিছু করে, জানবি তার পিছনে কোনও না কোনও কারণ বা আধ্যাত্মিক বিষয় জড়িয়ে আছে। নেংটি ধারণ করার সময় একটা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এই মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে কৌপীন ধারণের উদ্দেশ্য।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

— বাবা, মন্ত্রটা একটু বলবেন?

দ্বিধাহীন মনে সাধুবাবা মন্ত্রটা শুরু করতেই বললাম,

— বাবা, দয়া করে মন্ত্রটা একটু ধীরে ধীরে বলুন, আমি লিখে নিই। একবার শুনলে কিছু মনে থাকবে না। আমার জানাটাও হবে না।

সাধুবাবা বলতে লাগলেন, আমি লিখতে লাগলাম,

'ওঁ গুরুজি বন্ধকর বন্ধকর, বজ্রকর, বজ্রকর,
না মরে যোগী না পড়ে ফন্দ, চৌষট্ যোগিনী খেলে ছন্দ।
সত্কা ধাগা সন্তোষকি কৌপীন, নাগা পহরে নাগফণী,
হনুমান বাঁধে লেঙ্গোট্।
বালগোপাল কৌপীন বাঁধে, অনন্ত কোট সিদ্ধা কি ওট্।
বাঁধে চীর মনমে ধীর, সো প্রাণী জগত কা পৌর।'

এবার সাধুবাবা বললেন,

— বেটা, সাধুসন্ন্যাসীরা যেসব বস্ত্র পরিধান করেন, সেগুলিকে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, পরিধানের সময় বিশেষ কিছু মন্ত্রপাঠ করতে করতেই পরিধান করে থাকেন। মাথায় যে বস্ত্র বাঁধেন, তার নাম সাফা। আর হাত তিনেক লম্বা একটুকরো বস্ত্র পিঠ ও বুকের মাঝে বেঁধে রাখেন, তার নাম ব্রহ্মাঞ্চলা। সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে সাংকেতিক ভাষায় গেরুয়া বসন, বিভূতি আর কমণ্ডলু, এই তিনটিকে ফুল আর খর্পরকে বলে অর্ধেক ফুল। বেটা, অনেক কথা হল। এবার উঠি।

(খর্পর-দীক্ষার দিন গুরুজি এটি তুলে দেন সন্ন্যাসী শিষ্যর হাতে। ছোট্ট আংটাহীন কড়াইয়ের মতো। এতে ভিক্ষা করা যাবে। ভাত রাঁধা যাবে, রুটি করা যাবে, জলপানও। সন্ন্যাসীরা আনন্দিত হয়ে বলেন, 'ভোলেনাথ কা ভাণ্ডার।' এটা কাছে থাকলে প্রয়োজনের সবকিছু মিলবেই মিলবে।)

মনে মনে বললাম, সাধুবাবা তুমি উঠতে চাইলে কী হবে, আমি যে উঠছি না। খপ্ করে পা দুটো ধরে ফেললাম। মাথায় সাধুবাবার আশীর্বাদী পায়ের ধুলো দিয়ে বললাম,

— বাবা, তিলকধারণ, গায়ে ভস্ম মাখার মতো রুদ্রাক্ষধারণের সময়ও নিশ্চয়ই কোনও না কোনও মন্ত্রপাঠ করা হয়। দয়া করে বলবেন। এসব কথা বইয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু সাধুমুখে কথার মর্যাদাই আলাদা। গৃহী হিসাবে এগুলো হয়তো কাজে লাগবে না, তবুও জানলে অকল্যাণ তো কিছু হবে না।

এবার সাধুবাবা বললেন,

— বিভূতিধারণের মন্ত্র আছে। সাধুসন্ন্যাসীরা প্রতিদিন স্নানের পর যে মন্ত্র পাঠ করে গায়ে ভস্ম মাখেন, সেটা বলছি লিখে নে। শরীর অসুস্থ হলে এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে গায়ে ভস্ম মাখলে গৃহীদেরও শারীরিক সুস্থতা আসবে।

আমি কাগজ কলম নিয়ে তৈরি। সাধুবাবা মন্ত্রটা বললেন ধীরে ধীরে,

'আদ্কা যোগী অনাদকী বিভূত।
সত্কা নাতি ধরমকা পুত।
অম্বর বর্ষে ধরতী ধরে।
সো ফুল মাতা গায়ত্রী চরে।
সূর্যমুখ মুখে অগ্নিমুখ জ্বলে চন্দ্রমুখ শীতলে,
সো ভস্মবতী মায়ী অনন্ত কোট সিদ্ধোকে হস্তকলে
মস্তক চঁড়ে চড়াই খাক হুয়া দেলপাক,
অলখ্ নিরঞ্জন আপই আপ।
ভস্মবতী মায়ী যাঁহা পাই তাঁহা রমাই।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলাম। এক অনাস্বাদিত আনন্দে মনটা ভরে গেল। সাধুবাবা আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করেছেন। জানালেন, ভিন্ন স্বাদের এমন এক বিষয়ের কথা, যা আমার আগে জানা ছিল না। যত শুনছি ততই মনটা মাতোয়ারা হয়ে উঠছে। মুখ দেখে মনে হল, সাধুবাবাও খুশি আমার মতো এমন একটা শ্রোতা পেয়ে। সাধনপথের কথা বুঝি বা না বুঝি। এতক্ষণ পর এবার সাধুবাবা আমার কাছে জানতে চাইলেন,

— বেটা, তুই কোথায় থাকিস? কী করিস?

আমি কলকাতায় থাকি এবং কী করি তা জানালাম। শুনে হালকা হাসিতে ভরিয়ে ফেললেন মুখখানা। সাধুবাবা বৈষ্ণব। এবার মহানন্দে বললেন রুদ্রাক্ষধারণের মন্ত্রের কথা,

— বেটা, রুদ্রাক্ষধারণের সময় মন্ত্রপাঠ করতে করতেই রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে হয়। 'ওঁ গুরুজি। রুদ্র রুদন্তি বিষ্ণু জপন্তি কায়া রখন্তি, মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে বিষ্ণু লিঙ্গ লিঙ্গ সর্বদেব লিঙ্গ, রুদ্রদেব নমস্কার।'

একটু থামলেন। কিছু একটা ভাবলেন। পরে বললেন,

— বেটা, আর আমাকে আটকাস না। এবার আমি উঠি।

আমি আর বাধা দিলাম না সাধুবাবাকে। আমাদের কথার মধ্যে ফাঁক-ফোকর খুঁজে জেনেছিলাম সাধুবাবার গৃহত্যাগের কাহিনি, কেমন করে কাটছে তাঁর জীবন, কী পেলেন আর কী পেলেন না, কিসের আশায় চলছে তাঁর অনিশ্চিত জীবনের পথচলা এমন নানা জীবনকথা।

শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত এই বৈষ্ণব সাধুবাবা পাশে রাখা ঝোলাটা কাঁধে নিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলাম। ঝোলাটা দেখে মনে হল এতই হালকা, এতই ছোট, পরপারের সঙ্গী করলেও সে পথচলায় এতটুকুও কষ্ট হবে না তাঁর। আমরা সংসারী। আমাদের বিষয়ের ঝোলাটা এত ভারি, পৌঁছনো বোধহয় আর হবে না! ⌘⌘ **সমাপ্ত**

কিছু ভ্রমণ সংক্রান্ত বই

এ বছরই 'মিত্র ও ঘোষ' পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'শিবভূমি হিমালয়'। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের লেখা এ বই নিছক ভ্রমণকাহিনি নয়। ধর্মীয় বিষয়েও আবদ্ধ নয়, বরং এ বই হিমালয়ের চিরকালীন রহস্যময় সৌন্দর্যের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করায়। বাঙালি ভ্রমণপিপাসুর কাছে বরাবরই হিমালয়ের টান প্রবল। নিছক ভক্তিরস না থাকলেও হিমালয়ের মনোরম প্রকৃতির টানেও ছুটে যায় বাঙালি পর্যটক। কখনও পথের কষ্টে তাঁরা ক্লান্ত হন। তবুও পর্বতারোহণের মজাটাকে তাঁরা উপভোগ করেন। এ বই সেই পাঠকদের জন্যই।

'দে'জ' পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত নবনীতা দেবসেনের লেখা 'ভ্রমণ সমগ্র'-র দু'টি খণ্ডই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নানা দেশে ঘোরার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও তথ্যে সমৃদ্ধ সংকলন দুটি পর্যটনবিলাসীরা হাতে নিয়ে দেখতে পারেন।

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'ভ্রমণের নবনীতা' বইটি আজকের পাঠকদের জন্য। নানা দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বইটি পাঠকের মনে কৌতূহল সঞ্চার করে।

বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি, মানুষ সম্পর্কেও নতুন তথ্য দিয়েছেন নবনীতা দেবসেন।

'রাণার' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত 'ভ্রমণে দক্ষিণ ভারত' এবং 'ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ট্রেকিং সাথী' বই দুটি দেখতে পারেন।

'কামিনী প্রকাশনালয়' ভ্রমণবিলাসী বাঙালির হাতে পৌঁছে দিয়েছে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বই। 'ট্যুরিস্ট গাইড'– ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের জন্য এ বই। প্রতিটা জায়গায় থাকার বিবরণ, সর্বশেষ থাকা-খাওয়ার দামের তালিকা পাবেন এতে। সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙিন ফোটোগ্রাফ। সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত বইটি খুবই প্রাসঙ্গিক। দাম ২৫০ টাকা।

'অভিযান' থেকে প্রকাশিত কয়েকটি ভ্রমণ বিষয়ক বই-এর মধ্যে উল্লেখ্য অরুণাভ দাস ও মুনতাই চ্যাটার্জি সম্পাদিত কিছু বই। 'চলো যাই হিমালয়', 'রংবাহারি আন্দামান', 'গাড়োয়াল হিমালয়', '১০১ হানিমুন স্পট' ইত্যাদি। প্রতিটি বইতে মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খুঁটিনাটি তথ্য ছাড়াও আছে বর্ণনা। অরুণাভ দাসের লেখা 'উইকএন্ড ভ্রমণ' তো সবসময়ের জন্য উপযোগী।

রহস্য রোমাঞ্চে ভরা সবুজ দ্বীপ চিরকালই অন্য বিদেশের সন্ধান দেয়। এমনকী সুনামির পরে আন্দামানের নতুন রূপ আরও সুন্দরতর হয়েছে। যদি যাওয়া ঠিক করে থাকেন, তবে দেবল দেববর্মার লেখা 'দেখে এলাম আন্দামান-নিকোবর' একবার পড়ে দেখতে পারেন। দাম ৮০ টাকা। দে'জ থেকে চলতি বছরেই প্রকাশিত হয়েছে।

'কমলিনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভ্রমণকথা'। দাম ১৫০ টাকা। বইটিতে সমকালীন কিছু জায়গার ইতিহাস আজকের পাঠককেও অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

সেই সব রঞ্জনীয় লেখা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

৩০.৭.১৯৭৬ সালে অজয় কর পরিচালিত 'দত্তা' মুক্তি পাবার পর ছবিটি দেখে 'দেশ' পত্রিকায় সমালোচনা করতে গিয়ে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন— 'বিজয়ার ঘরে পাথরের দেওয়াল ব্র্যাকেটের ফুলদানিতে প্লাস্টিকের নামগোত্রহীন ফুল! আর আপনার দম ফেলতে কষ্ট হবে যখন দেখবেন বিজয়া (সুচিত্রা সেন) তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে একেবারে একেলে ভঙ্গিতে 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' গানটি গাইছেন এবং তাঁর বারান্দার গাছটিতে প্লাস্টিকের ফুল ফুটেছে! এবং বিজয়া আইলাইনার ও ফ্রসটেড লিপস্টিক ব্যবহার করেন, এবং তাঁর হাতের নখ ছুঁচলো আধুনিক (বালা খুলে ফেলার দৃশ্যটি লক্ষণীয়)। কিন্তু যা দেখে সবচেয়ে তাক লাগবে তা হল নদীর ধারে নরেনের সঙ্গে কথাবার্তার দৃশ্যে ধাঁ করে তাঁর কানের দুলটি পালটে যায়!' রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর পরিচালক তপন সিংহ এই সমালোচনার বিরোধিতা করে 'দেশ' পত্রিকায় একটি প্রতিবাদ পত্র লিখেছিলেন। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৮.৮.১৯৭৬-এ। প্রতিবাদ পত্রটিতে ছিল— 'দত্তা'র সমালোচনাকে মূর্খতার অপহাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে একটি স্কুলের ছেলেও ক্লোজ শট, লং শট, লাইট সোর্স প্রভৃতি কথাগুলো জানে। সুতরাং সমালোচনায় ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করে বিশেষ বাহাদুরী উনি পাবেন না। বরং থ্রি স্কীম লাইটিং, টু স্কীম লাইটিং বা মনো-কী লাইটিং সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দিলে বাধিত হতাম। এই সিনেমার ভাষাতত্ত্ববিদটির প্রতি আমার উপদেশ বাংলার মাটি গায়ে মাখুন, বাংলার জলে স্নান করুন। উপদেশটি যদি না মানতে চান তবে একটু সৎসাহস দেখিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ান, খালি কলসীতে কত আওয়াজ একবার দেখি।' তপন সিংহ

তপন সিংহর এই চিঠির সঙ্গে একেবারেই সহমত পোষণ করেননি আর এক পরিচালক ও চিত্রি পূর্ণেন্দু পত্রী। তিনি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে লিখেছিলেন— 'তপনবাবুর মত পরিচালকের সকলের আগে খুশী হওয়া উচিত, তিনি যে হঠাৎ কেন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। এই চিঠির ভাষা তাঁর মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর।' পূর্ণেন্দু পত্রীর চিঠি ছাড়াও রয়েছে আরও অনামী পত্রকারদের ১৬টি চিঠি, যেগুলি রঞ্জনবাবুর সমালোচনা সমর্থন করে লেখা। একটি লেখাও নজরে পড়ল না তপন সিংহর মতকে সমর্থন করে । এই অংশটি বাদ দিলে বইয়ের মান বাড়ত বই কমত না। কারণ এই চিঠিগুলি প্রকাশ করে রঞ্জনবাবুর কলমের জোর কতখানি তা পাঠককে বোঝানোর দরকার ছিল না এবং কোনওভাবেই এগুলি 'সেই সব লেখা'কে ঋদ্ধ করেনি।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯০, প্রায় চোদ্দো বছর, কখনও একটানা আবার কখনও বা ছাড়া ছাড়া ভাবে চলচ্চিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকায়। সেই সব ক্ষুরধার লেখনীতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়কার বাংলা চলচ্চিত্রের চেহারা, কোন কোন ছবি সে সময়ে মুক্তি পেয়েছিল এবং কেমন মান ছিল সেই ছবির, নায়ক-নায়িকা, পার্শ্ব অভিনেতা বা পরিচালকদের ক্যারিশমা (ভাল ও খারাপ) ছাড়াও দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বহু কথা। বলতে দ্বিধা নেই সেই সব লেখা (বিশেষ করে সমালোচনা) একটা নতুন ধারা তৈরি করেছিল। তাঁর রচনার ঝাঁঝ, মজা একটা যুগকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল। আমরা যারা তখন নব্য যুবক, নিজেদের বোদ্ধা বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম, তখন সপ্তাহান্তে পত্রিকাটি হাতে পেয়েই 'সেই সব রঞ্জনীয় লেখা' গলাধঃকরণ করে পাড়ার রক, চায়ের দোকান, শ্যামবাজার কফিহাউসের আড্ডায় 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলে বন্ধুমহলে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। কথায় কথায় উঠে আসত নায়িকাদের নিয়ে রঞ্জনবাবুর রমণীয় বিশেষণ। যেমন 'অবিকল্প মাধবী'তে তিনি লিখেছেন- 'যা আমাদের প্রথমেই ধাক্কা দেয় তা হল সব পরিচিত হিসেবনিকেশকে এক ঝোড়ো দাপটে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা। .. আজও কি কখনো-কখনো নির্জন অন্ধকার আলোড়িত করে জেগে ওঠে না সেই ছায়া-ছায়া ব্যথা-ঘন চোখ?' আবার 'অপর্ণা সেন' প্রসঙ্গে তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে সেই সব কঠিন সত্য— 'অপর্ণা সেন সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু তাঁর বিষয়ে সবচেয়ে প্রথম কথাটি হল টালিগঞ্জে আজ তাঁর কোনো বিকল্প নেই। নেই কেননা অপর্ণার ইমেজের মধ্যে যেটা তার একান্ত নিজস্ব ক্যারিশমা বা চারিত্রিক রামধনু— অনুরণন, সেটা সম্ভব হয়েছে

বামনদেব চক্রবর্তী-র

১) **উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ (IX-X)** ৬৪৪ পৃষ্ঠার বই - অষ্টাদশ প্রকাশ: ১৪০৲। অলঙ্কার, ভাষা ও উপভাষা এবং দল - বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সহ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ।

২) **মাধ্যমিক বাণী-বিচিত্রা (IX-X)** ৭২০ পৃষ্ঠার বই - দশম সংস্করণ: ১২৫৲। পূর্ণাঙ্গ নির্মিতি - ৬৭টি ভাব-সম্প্রসারণ, ৬১টি ভাবার্থ, ২৮টি সারাংশ, ১০৬টি প্রবন্ধ, ৪০টি বঙ্গানুবাদ, ২১টি সভার কার্যবিবরনী, ৪১টি প্রতিবেদন এবং 'সহায়ক পাঠ'-এর প্রতিটি গল্প-কবিতার ১১২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী অজস্র প্রশ্নোত্তর (মৌখিক সহ)।

দুটি বই-ই একসঙ্গে কিনলে সাধারণ ক্রেতারা ২০ শতাংশ ও পুস্তক বিক্রেতারা ২৫ শতাংশ কমিশন পাবেন।

৩) **ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ ও ছাত্রবোধ বাণী-বিচিত্রা (IX-X)** - ব্যাকরণ ও নির্মিতি ১৪০৲
(মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচী অনুসারে ৫৫২ পৃষ্ঠার বইটিতে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যাকরণ ও নির্মিতি)

৪) **বাণী-বিচিত্রা (VII-VIII)** - ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৮৫৲

৫) **অঙ্কুরে ব্যাকরণ ও রচনা (VI)** - ৩৫৲

৬) **ভাষাশিক্ষায় হাতেখড়ি (V)** - ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৭০৲

তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শ্রীমতি কেয়া রায়চৌধুরী রচিত

(২০০৪ সালে নবপ্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে) মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত সুলিখিত বই

১) **সাহিত্য-মালঞ্চ (১ম ভাগ - VI)** - বাংলা পাঠ্য
২) **সাহিত্য-মালঞ্চ (২য় ভাগ - VII)** - বাংলা পাঠ্য
৩) **সাহিত্য-মালঞ্চ (৩য় ভাগ - VIII)** - বাংলা পাঠ্য
৪) **মালঞ্চ-সংকলন (১ম ভাগ - VI)** - সহায়ক পাঠ
৫) **মালঞ্চ-সংকলন (২য় ভাগ - VII)** - সহায়ক পাঠ
৬) **মালঞ্চ-সংকলন (৩য় ভাগ - VIII)** - সহায়ক পাঠ
৬) **ভাষা-মালঞ্চ (১ম ভাগ - VI)** - ব্যাকরণ ও নির্মিতি
৭) **ভাষা-মালঞ্চ (২য় ভাগ - VIII)** - ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বামনদেব চক্রবর্তী ও কেয়া রায়চৌধুরী প্রণীত

মাধ্যমিক মালঞ্চ-মালা (দশম শ্রেণী)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সর্বাধুনিক পাঠ্যসূচী ও নির্দেশ অনুসারে লেখা 'পাঠ সংকলন' ও 'সহায়ক পাঠ'-এর নির্বাচিত প্রতিটি গল্প কবিতার সুবিস্তৃত অসংখ্য প্রশ্নোত্তর (পাঠভিত্তিক ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর ও মৌখিকসহ), ব্যাকরণ ও নির্মিতি নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ - ভালো - মন্দ - মাঝারি সব ধরনের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশা নম্বর পাওয়ার উপযোগী (২০০৲)

শ্রী কুঙ্কুম চক্রবর্তী রচিত

গণিত-মালঞ্চ (অবজেকটিভ) - নবম-দশম, ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রতিটি মাধ্যমিক ও তত্তুল্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর, নামী স্কুলের ৩০৯টি নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর এবং ২০০৯-এর পাঠ্যসূচি অনুসারে নব-সংযোজিত অংশ সহ ৭৭০ পৃষ্ঠার অনন্য গ্রন্থ - ১৬শ সংস্করণ ঃ ১০০৲

বাংলা ভাষায় একখণ্ডে বৃহত্তম ক্যুইজের বই

ক্যুইজ ১১১১১ ১৮০৲

(পুরাণ-মহাকাব্য-ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র-শিল্প-সংগীত, খেলাধুলা, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে **১১১১১টি** চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তরের আকর্ষণীয় আনন্দসম্ভার - সর্বস্তরের যেকোনও কুইজ প্রতিযোগীতার, ব্যক্তিগত সংগ্রহের, প্রিয়জনকে উপহার দেবার এবং পাঠাগারে সংরক্ষণের একান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ)

কুঙ্কুম চক্রবর্তীর **মাধুরী মিশায়ে** (১২৫)
মিষ্টিমধুর ভালোবাসার দশখানি সুপাঠ্য বড়গল্পের সংকলন-গ্রন্থ (পৃঃ ৩৫০ + ১০)

অক্ষয় মালঞ্চ কে ৩/৬, মার্কাস স্কোয়্যার, কলকাতা - ৭০০ ০০৭
দূরভাষ ৯৮৩১৩২৫৬১২, ৬৫১০৭৩৩০

সেক্স-অ্যাপিল-এর সঙ্গে রোমান্টিক শাস্তায়নের (সাবলিমিশন), সৌন্দর্যের সঙ্গে শহুরে মার্জনার (সফিসটিকেশন) আর প্রতিভার সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের বিরল মিশ্রণে'। 'প্রণয়পাশা' সুচিত্রা সেনের শেষ অভিনীত ছবি। এই ছবি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সুচিত্রা সেন সম্পর্কে তিনি বলেছেন— 'শ্রীমতী সেন, এই পড়ন্ত বিকেলবেলাতেও, লং বা মিডশটে সুন্দরী'।

সুন্দরের পূজারী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সমালোচনাগুলো পড়লে যে নতুন পথ, স্বাদ, ভাষার নব তির্যকতা, মেধা আর বিশ্লেষণের মজা ও মাঞ্জা পেয়েছিলাম তা আবার নতুন করে সেই দিনগুলিকে মনে পড়িয়ে দিল 'দীপ প্রকাশন' প্রকাশিত 'সেই সব লেখাগুলি' বইটি । ২৭৬ পাতার অবশ্যপাঠ্য এই বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সালের চলচ্চিত্রের বিপজ্জনক ও প্রথাবিরোধী শৈলী। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও যার ভাষা আজও আধুনিক। ২০১২-তে এই বই ফিরে এল আজকের পড়ুয়াদের ঋদ্ধ করতে। সব শেষে একটি বাংলা সিনেমার সমালোচনা পেশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। ছবির নাম 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'। পরিচালক স্বদেশ সরকার। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮.৬.১৯৭৭-এ। 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত শুক্রবার, ২৭ মে ১৯৭৭ সাল দুপুরবেলা শ্রী স্বদেশ সরকার বাংলা চলচ্চিত্রের কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি মারলেন। বাংলা ছবির মরদেহটি রাধা, পূর্ণ, প্রাচীতে এখন রাখা হয়েছে। দর্শনেচ্ছুকরা স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তবে শবের গন্ধে বড় মাছির ভিড়। রাধা, পূর্ণ, প্রাচী প্রভৃতির টিকিট ঘরের প্রহরীরা বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন।'

সেই সব লেখাগুলি। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপ প্রকাশন। কলকাতা-৭০০০৭৩ । দাম ২০০টাকা ।

লিটল ম্যাগাজিন

একচল্লিশ বছর ধরে একটা লিটল ম্যাগাজিন সস্নেহে লালনপালন করে যাওয়া কম কথা নয়। বিশেষত তার মান বজায় রেখে যা 'মাঝি' পত্রিকাটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এই সাহিত্যপত্রের এবারের সংখ্যাটিও তার অন্যথা হয়নি। যথারীতি শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, আলোক সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা কবিদের কবিতায় সমৃদ্ধ। সঙ্গে অলোক সেন, রমা ঘোষের মতো অনুজ কবিরাও রয়েছেন। এছাড়া 'আমার রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে কৃষ্ণধর, সুমিতা চক্রবর্তী, রবিশংকর বলের লেখাগুলি পড়তে পড়তে ঘোর লেগে যায়। 'কালো রঙে অনেক ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, নিজের আত্মপ্রতিকৃতিও, কে এই রবীন্দ্রনাথ? এঁকে কি আমি চিনি?' রবিশংকর বলের এই ভাবনা অনেক গভীরে নিয়ে যায়।

মাঝি। সম্পাদক প্রশান্ত রায়। ৭ সুকিয়া রো, কলকাতা-৭০০০০৬।

রবীন্দ্রনাথ টেগোর হাসপাতালে / এত যে যন্ত্রণা সয়েছি-/ হে মহামতি আর. এন টেগোর / তুমি কি কখনও শুনেছ/ সে ব্যথা বাঁশিতে বাজিয়েছেন / বিমূর্ত সময়, কিম্বা/ বোলপুরের মূর্ত রাখালেরা? অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর এই কবিতাটি 'কবিতা ফোলডার'-এর এবারের সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কবিতা লিখেছেন বিমল দেব, রফিক আলম প্রমুখ। ফোলডার হলেও কবিতার কাগজটির একটা সুন্দর ভাবনা আছে। তবে সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের আর একটু যত্নবান হওয়া অবশ্যক।

কবিতা ফোলডার। সম্পাদক : মায়া চক্রবর্তী।
২/২ এ, সেলিমপুর লেন, কলকাতা-৭০০০৩১

'অবগুণ্ঠন' সত্যিই অনবদ্য। ১৫ পাতার বুকলেট আকৃতির এই সাহিত্য কাগজটি আজ ১৭ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনবিহীন, দেখলেই মনে হবে টিফিনের পয়সা জমিয়ে কয়েকজন সাহিত্য-নেশারু এই কাজে মগ্ন। তবে ক্ষুদ্র হলেও বিভিন্ন বিষয়ে লেখার যে গভীরতা তা সিরিয়াস পাঠককে মুগ্ধ করবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতাল, এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না'।

আবার তাঁর মতে, 'বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমন হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকৌতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে' বলতে গেলে এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভরা অরবিন্দ দাসের 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি এবারের সংখ্যার সম্পদ। এছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাও রয়েছে। নবীন লেখক-কবিদের এই পত্রিকাটিতে সম্ভাবনার ছাপ রয়েছে। কিন্তু সূচিপত্র নেই কেন?

অবগুণ্ঠন। সম্পাদক : অমিতাভ দাস।
শ্রীনগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২৬৩।

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

ফিরে দেখা

অর্পিতা প্রধান

সম্প্রতি হিন্দুস্থান পার্কের 'আকার প্রকার' গ্যালারি ও কিউরেটর দেবদত্ত গুপ্ত আরও একবার কলকাতাবাসীকে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তনের যে রূপরেখা তার একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দিলেন। 'আচার্য নন্দলাল বসু'র পর এবারে প্রদর্শনীর আলোয় আলোকিত হলেন নন্দলালের ছাত্র 'বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়'। এই ধরনের প্রদর্শনী একাধারে যেমন স্মৃতিরোমন্থনকারী, অপরধারে ছাপা অক্ষর কিংবা চিত্রিত নথিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মানসভ্রমণকে চাক্ষুস অভিজ্ঞতায় তৃপ্ত করবার সুযোগ করে দেয়।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের (১৯০৪-১৯৮০) জন্ম কলকাতায়। শিল্পশিক্ষা শান্তিনিকেতনে। শৈশব থেকেই ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুরু নন্দলালের শিক্ষার (মৌলিক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা) আদর্শে আদর্শায়িত এই শিল্পীর বিভিন্ন সময়ের শিল্পকর্মগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে, যেমন– কালি তুলি, ক্যালিগ্রাফি, কালি-কলমের নিসর্গচিত্র, কালি-কলমের কম্পোজিশন, ছাপাই ছবি এবং অন্যান্য মাধ্যমে রচিত বিভিন্ন শিল্পকর্ম।

'কালি-তুলি' পর্বে দেখা গেল মূলত পোস্টকার্ডের একদিকে ছবি ও অন্যদিকে লেখা চিঠি। এই চল আমরা নন্দলালের ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম। চিন ও জাপানের ক্যালিগ্রাফির ছন্দকে মিলিয়ে বিনোদবিহারী ক্যালিগ্রাফির একটি নিজস্ব আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন যা এই প্রদর্শনীর 'ক্যালিগ্রাফি' পর্বে প্রদর্শিত 'পথে বিপথে, অবনীন্দ্রনাথ', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' লেখাগুলি দেখলে বোঝা যায়। কালি-কলমের নিসর্গচিত্র ও কম্পোজিশন পর্বে দেখা গেল মূলত শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশের কর্মরত মানুষজন, পশুপাখি ইত্যাদির ছবি। যেখানে রেখা কখনও নিরবচ্ছিন্ন আবার কখনও বা ভঙ্গুর হলেও গতিময়তার ব্যাঘাত কোথাও ঘটেনি। এই পর্বের বেশকিছু কাজে দেখা গেল সমগ্র পটের খানিকটা অংশ চিত্ররচনা করে বাকি অংশ শূন্য। যে শূন্যতা ছবির বিষয়বস্তুতে আলাদা মাত্রা যোগ করে। পাশাপাশি এই শূন্যস্থান সমগ্র ছবির ভাষাকেও সম্পৃক্ত করে। কাঠখোদাই, লিনোকাট, এচিং, লিথোগ্রাফ বিভিন্ন মাধ্যমে কৃত শিল্পীর ছাপাই ছবির ক্রমবিবর্তন ধরা পড়ে প্রদর্শনীর এই ছবি পর্বে।

তবে এসবের পাশাপাশি এই প্রদর্শনীর অন্যতম নিদর্শন হল বিনোদবিহারীর আঁকা টেস্টটাইল। এবং বিভিন্ন কাগজ ও কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মিত একটি অসামান্য কোলাজের ছবি ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিকীকরণের ইঙ্গিত বহন করে।

অর্থাৎ এই প্রদর্শনী উত্তর আধুনিকতার নামে নানান পরীক্ষার কোলাহল থেকে এমন এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়, যা একলেকটিজম থেকে ভারতীয় আধুনিকীরণের বিকাশ পর্বের মূল গতিপথকে যেন পুনরায় মনে পড়ায়। ⌘⌘

চিলের কান্না

শ্যামলকান্তি দাশ

আকাশের তলায় তলায়
একটা ঘরছাড়া চিল উড়ে বেড়াচ্ছে।
তার চোখের জল আমাদের গায়ে পড়ছে,
আমরা শুনতে পাচ্ছি তার কান্না।

চিল উড়তে উড়তে নির্মল আকাশে
ধাক্কা মারছে, একবার দু'বার শতবার–
ঢুঁসো মারতে মারতে অন্ধকারে
শান্ত আর নির্জন উড়োজাহাজের
ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।
গলগলে আগুন আর ধাতু আর বুকচাপড়ানি
ছিটকে আসছে পৃথিবীতে,
পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের
সোনা বাঁধানো অকলঙ্ক জীবন!

চিল আমাদের ভালবাসার পাখি,
আমাদের অন্ধকারের বন্ধু।
মাছপুকুরের সামনে সে বসে আছে ঠিকই,
কিন্তু তার কান্না আমাদের কান্নার মতোই সুন্দর,
সূর্যাস্তের আগে বারবার আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে!

চারুলতা

অংশুমান কর

আবার এসেছে ও
আকাশ ছেয়ে ফেলেছে
না, আষাঢ় নয়
ও হঠাৎ কারেন্ট অফ হয়ে যাওয়া
কলকাতার মতো ভয়ংকর, অসহিষ্ণু, ক্ষিপ্ত
ওর গর্জন শুনতে পাচ্ছে
গ্রাম থেকে শহর, বস্তি থেকে ফ্ল্যাটবাড়ি
৩৭ থেকে ৫৭
তোমার শেকড় যদি জল না পায়
যদি গ্রীষ্ম হয় ভয়ংকর
ও আসবেই
ও ঝড়,
প্রেম, পরকীয়া
যদি বাঁচাতে চাও তোমার ফুল, পল্লব
শাখাপ্রশাখা
মাথা দোলাও
বাধা দিও না

ছবি: দীপঙ্কর রায়

যাত্রা

অর্থিতা মণ্ডল

আমাদের নিমগ্নতা ছুঁয়ে বৃষ্টি নকশা তুলছে....
আমরা ভিজে যাচ্ছি তুমুল–
যাবতীয় অবহেলা ধুয়ে ফেলে
দগ্ধ অভিমান ছুঁয়ে হাত–
দ্যাখো, জমাট মেঘের গায়ে খাঁজ
কেটে কেটে নেমে আসছে মেঘমল্লার
শরীর জড়িয়ে বেজে উঠছে রাগিণী–
এসো, স্রোত ভেঙে ভেঙে আমাদের আবহমান যাত্রা...

সবুজ

অনুপম মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের গায়ে ময়লা জমেছে
তৃণভোজী জন্তুগুলো চরে বেড়াচ্ছে তার আড়ালে

সবুজ... সবুজ সবুজ
নাছোড়বান্দা আষাঢ় মাসে ছুটে আসছে বুনো ঘোড়ার পাল

আর, জল ছিটকে খনিজের বয়স কমে যাচ্ছে
আনাজের বয়স কমে যাচ্ছে

স্বপ্নে দেখছি আমার চোখের মণি
ভিনগ্রহের আলোর চেয়েও সবুজ

বন্য হাতিরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে কেন?

আগে ডুয়ার্স-তরাইয়ের বিস্তৃত ভূমি ছিল ঐরাবত কূলের বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু এখন এই এলাকার বনাঞ্চলে মাত্র ২২০০ বর্গ কিলোমিটার হাতির চারণক্ষেত্র। সাম্প্রতিক অতীতে, চীন-ভারত যুদ্ধের পর বেংডুবিতে গঠিত হল বিশাল সেনাছাউনি। হাতি তবে যায় কোথায়! ফলে মানুষের আবাদি জমি পতিত হয়ে থাকছে, স্রেফ হাতির ভয়ে। অথচ আগে এমন ছিল না। হরজিতের কথাই যদি ধরি, সে ছিল ১০ ফুট ২ ইঞ্চির একটি বিশাল চেহারার মাকনা হাতি। বেংডুবির জওয়ানরাই তাঁদের এক মেজাজি কমান্ডার হরজিৎ সিং-এর নামে হাতিটির নাম রেখেছিলেন। তবে মেজাজি হলেও হাতিটি প্ররোচনা সত্ত্বেও কখনও কোনও মানুষকে মারেনি। কখনও হয়ত সে জওয়ানদের ফুটবল খেলা পণ্ড করে দিয়ে একা একা মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। তবে এখন কেন এই হাতি ও মানুষের সংঘাত? আজকের প্রচ্ছদ কাহিনিতে হাতির বিপন্নতা, মানুষের অসহায়তা, এ রাজ্যে হাতির ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন

দেবাশিস আইচ

জাবড়া মোড়ে বটগাছটার নীচে থামা গেল। তরাইয়ের নকশালবাড়ি থানার নেপানিয়া গ্রামের নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ গোল ভিড় করে শোনাচ্ছেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা। সদ্য সদ্য মেচির ন'নম্বর মৌজার নেপানিয়া 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'এর (জিটিএ) আওতায় এসেছে। বহু বছর ধরে এই গ্রামে তাদের বসত। অথচ জমির পাট্টা নেই, পানীয় জল নেই, হাতির উৎপাত। তবু, জিটিএ-তে আসতে পেরে তাঁরা খুশি। খুশি আত্মমর্যাদার প্রশ্নে, আইডেন্টিটির বিচারে। এরই মাঝে প্রায় মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তিনি ক্ষেমরাজ কৈরালা। ভিড়ের যুক্তির সঙ্গে তাঁর মত ভিন্ন। কৈরালার স্পষ্ট কথা, তাঁর কাছে জিটিএ বাঁচা-মরার সমস্যা নয়। সমস্যা হাতির উৎপাত।

ডুয়ার্স-তরাইয়ের বিস্তৃত ভূমি ঐরাবত কুলের বিচরণ ক্ষেত্র। পশ্চিমে ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর তীর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-অসম সীমান্তের সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত ৬৯০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। কিন্তু, এই এলাকায় বনাঞ্চল বর্তমানে মাত্র ২২০০ বর্গ কিলোমিটার হাতির চারণক্ষেত্র। তরাইয়ের যে জনপদে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে গ্রামে ক্ষেমরাজের বাবার ১০ বিঘা জমি পতিত হয়ে রয়েছে, স্রেফ হাতির ভয়ে। ফসল ফলালেও তা ঘরে তোলা যাবে না। এই জনপদ একদিন প্রকৃতই অভয়ারণ্য ছিল। প্রথমে চা বাগান, তার পর কাজের খোঁজে আসা মানুষ একটু একটু করে এই বনাঞ্চল কব্জা করেছে। সাম্প্রতিক অতীতে, চীন-ভারত যুদ্ধের পর বেংডুবিতে গঠিত হল বিশাল সেনাছাউনি। প্রাকৃতিক অভয়ারণ্যের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হল। ইস্টার্ন কম্যান্ডের সেই সেনাছাউনি এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাশহরও বটে। কী নেই সেখানে। গলফ কোর্স, শপিং কমপ্লেক্স, সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য 'টুরিস্ট স্পট' মাউন্টেন ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদি প্রভৃতি। আর রয়েছে এক গভীর জঙ্গলে ঢাকা গোলা-বারুদের ডিপো। হাতি তবে যায় কোথায়! সেনা ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই যেখানে, সেখানেও হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে ঢুকে পড়ে হাতির পাল। খেলতে খেলতে, নাকি বাঁচার তাগিদে?

যদি পিছনে ফিরে তাকান যায়, তবে দেখতে পাব, ওই গলফ কোর্সে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা মাকনা। মানে দাঁতহীন পুরুষ হাতি। কিংবা ওই ফৌজি ছাউনিতেই চাকনা, অর্থাৎ ছোট কিন্তু মোটা দাঁতের একটা গুণ্ডা হাতিকে সহবত শেখাতে গিয়ে কীভাবে প্রাণে বেঁচেছিলেন প্রদীপ ব্যাস (বর্তমানে, সুন্দরবন জীবপরিমণ্ডলের অধিকর্তা)। হস্তী বিশারদ ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর সৌজন্যে, সে কাহিনি অনেকেই আমরা জানি। তবে, হরজিৎ-এর কথা বলার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। হরজিৎ ছিল ১০ ফুট ২ ইঞ্চির একটি বিশাল চেহারার মাকনা হাতি। বেংডুবির জওয়ানরাই তাঁদের এক মেজাজি কমান্ডার হরজিৎ সিং-এর নামে হাতিটির নাম রেখেছিলেন। ওই কমান্ডারের মতোই হাতিটিরও একটা চোখ ছিল খারাপ। তবে মেজাজি হলেও হাতিটি প্ররোচনা সত্ত্বেও কখনও কোনও মানুষকে মারেনি। কখনও সে বিকেলে জওয়ানদের ফুটবল খেলা পণ্ড করে দিয়ে একা একা মাঠে ঘুরে বেড়াত। কখনও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাংলোর গেটে 'ধরনা' দিত। এক কথায় কার্শিয়াং বন দফতর এলাকায় সে রাজার মতো বিচরণ করত। ধৃতিকান্তবাবুর ভাষায়, 'মাঠের ফসল, ঘরের পাশের কলাগাছ, কলা এসবই ছিল তার প্রাপ্য খাজনা ও নজর...।' এমনকী ফৌজিদের খাদ্য গুদামে যখন তখন হানা দিয়ে লুঠপাট চালাত। ফৌজিরা একবার হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, হরজিৎ একবছরে ২১ লাখ টাকার ময়দা খেয়েছে, আর পেটি পেটি মিলিটারি রাম। শেষ পর্যন্ত ওই গুদামের চার পাশে বড় পরিখা তৈরি করে হরজিতের হাত থেকে বাঁচতে হয়েছিল। এহেন হরজিৎকে কোনওদিন বাগে আনতে পারেনি এলিফ্যান্ট স্কোয়াড এবং তাদের চকলেট বোমা, দোদমা, হাউই কিংবা জ্বলন্ত মশাল। ধৃতিকান্তবাবু জানিয়েছেন, 'নিঃসন্দেহে হরজিৎ ঔদরক ছিল। কিন্তু, মানুষের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ছিল না; সে একটিও মানুষ মারেনি।' ১৯৭৭ সালে তৎকালীন বনমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্রে হামলা চালানো, ফসল লুঠ ও ঘর ভাঙার অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

আর আজকের বেংডুবির ফৌজি এলাকায় প্রায়শই শোনা যাবে হাতি হাবুডুবু খাচ্ছে। গোলা-বারুদের ভাণ্ডারের জন্য বেংডুবি সবসময়ই 'অগ্নিগর্ভ'। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রয়েছে বড় বড় পাড় বাঁধানো জলাশয়। ঘর্মগ্রন্থীহীন প্রাণী আবার বিশালকায় চেহারার জন্য হাতির জল একটু বেশিই লাগে। আর সেই জল দেখে অতিরিক্ত কৌতূহলে শিশু হাতি নেমে পড়ে জলাশয়ে। কিন্তু, বাঁধান পাড়ের জন্য উঠে আসতে পারে না। শিশুকে বাঁচাতে মা হাতিও নেমে পড়ে। তারও হয় একই দশা। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর দায় পড়ে যন্ত্রপাতি এনে পাড় ভেঙে, রাস্তা বানিয়ে মা ও সন্তানকে উদ্ধার করা। এখন শোনা যাচ্ছে ফৌজি ও চা বাগান এলাকায় জলাশয়গুলি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। অর্থাৎ, এবার প্রয়োজনীয়

ডুয়ার্সের তিন দাঁতাল

জলটুকু থেকেও এই প্রাণীটিকে বঞ্চিত করার প্রয়াস।

জাবড়া মোড় থেকে ডানহাতে ইট ফেলা রাস্তা দিয়ে এক-দেড় কিমি পার হলে কার্শিয়াং ডিভিশনের মেচি জঙ্গল। এখানে রয়েছে একটা বনবসতি। ২৬ ঘরের মধ্যে ঝাড়খণ্ডী আদিবাসী পরিবার ন'টি, বাকিরা নেপালি। বনদফতরের ভাষায় এই কলাবস্তি একটি 'ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি বা এফপিসি ভিলেজ'। অর্থ্যাৎ, এখানকার আদিবাসী ও অন্যান্যদের কাজ বনরক্ষা করা, চারা লাগানো, বন পরিষ্কার করা। এই কড়ারেই একদিন এদের পূর্বপুরুষরা বনে বসত স্থাপন করেছিলেন। আমাদের পথ প্রদর্শক রাজকুমার রিজেল। সে এই বনবস্তিরই বাসিন্দা। টগবগে এই যুবক কেন্দ্রীয় বনাধিকার আইন অনুযায়ী তদ্বির তদারকি করে আদিবাসীদের জন্য বাসস্থানের শংসাপত্র বা পাট্টা যোগাড় করে দিয়েছেন। রাজকুমারদের সামান্য জমি রয়েছে। বনবস্তির পিছনে সেই জমি, তার পরেই মেচি বন। জমি পড়ে রয়েছে, কেউই চাষ করেননি। বিষয়টি এরকম, হাতিকে খাওয়ানোর জন্য কে চাষ করবে? পয়সা খরচ করে, পরিশ্রম করে ফসল ফলানোর পর হাতি যখন ফসলের দখল নেয়, তখন এই গরিব মানুষগুলোর চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। বন দফতর যা ক্ষতিপূরণ দেয় তাতে 'পোষায়' না। তাই হাতি নিয়ে অসন্তোষ সর্বত্র। রাজকুমারের কাছেও হাতি এক 'মস্ত' আপদ। ও আমাদের খবর দিলেন, মেচি নদীর ওপারে একটা বাচ্চা হাতিকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে নেপালের বাসিন্দারা। মেচি নদী পার হলেই নেপাল। ভারতীয় হাতিরা খাবারের জন্য মেচি পার হলেই ছুটে আসে

গুলি। মারা পরে তারা। আহত হয়ে পালিয়ে আসে ভারতীয় ভূখণ্ডে। সে হাতি ভয়ংকর। তার জন্য আবার প্রচণ্ড আশঙ্কায় থাকতে হয় এপারের বাসিন্দাদের। একটি হিসেব বলছে, গত ১১ বছরে নেপালে ঢুকে পড়ার অপরাধে ১৪টি হাতিকে গুলি করে বা অন্যভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক বলে অনেকটাই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় রাজ্যের বন দফতরকে। আমাদের মেচি দর্শনের সময় এমনই গোলাগুলির খবর পাওয়া গেল। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মেচি বনাঞ্চলে রয়েছে ৬০টি হাতি এবং নেপালে রয়ে গিয়েছে আরও ৪০টি। একটি ১৫ বছরের হাতির সামনের বাঁ পায়ে গুলি লাগায় সেটা খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। শেষ পর্যন্ত কুনকি হাত দিয়ে সেটাকে দলছুট করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা শুরু করে বন দফতর। তরাই-ডুয়ার্সের যে প্রান্তেই যান, চা বাগান, বনবস্তি বা বন সংলগ্ন এলাকা হাতি আজ যেন এক 'মূর্তিময়ী অভিশাপ'। এই অঞ্চলের মানুষের সমস্যার কথা জানতে চাইলে তারা যেমন বলবে, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, মজুরি, চিকিৎসার অভাবের কথা, তেমনই বলবে হাতির কথাও। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে।

১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত, উত্তরবঙ্গে হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ৮৮, আহত ৪৪৭। আহত বা নিহত গৃহপালিত পশু ৪২৫। ফসলের ক্ষতি ১৭৪৯.০৬৬ হেক্টর, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর ৩৬১১। এইসময়ে উত্তরবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৪৯টি হাতির। তার মধ্যে বেংডুবি সেনাছাউনিতে জলাশয়ে ডুবে মরেছে একটি হাতি এবং ১৬টি হাতির মৃত্যু হয়েছে ট্রেন ও মালগাড়ির ধাক্কায়।

ওই একইসময়ে দক্ষিণবঙ্গে হাতির আক্রমণে মারা গিয়েছেন ৫১জন মানুষ, আহত ৮১। আহত বা নিহত হয়েছে আটটি গৃহপালিত পশু। ৬৩০৫.০৮৬ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭৮৬টি। এইসময়ে দক্ষিণবঙ্গে ১৪টি হাতি মারা গিয়েছে। এদের মধ্যে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে পাঁচটি হাতি।

সারা দেশের দিকে যদি তাকাই, তবে এক ভয়াবহ ছবি দেখতে পাব। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক হাতির হালহকিকত বুঝতে একটি 'এলিফ্যান্ট টাস্ক ফোর্স' গঠন করেছিল। তাদের রিপোর্ট বলছে, দেশে হাতি-মানুষের সংঘাতে বছরে গড়ে পাঁচ লক্ষ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বছরে গড়ে মারা যান ৪০০ মানুষ, অন্তত ১০০ হাতি মারা পড়ে। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রায় ১৫০টি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মারা গিয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে হাতির দাঁতের লোভে চোরা শিকার। ১৯৯১-৯২ ও ২০০৪-০৫-এর মধ্যে ৭৬৯টি হাতি দাঁতের জন্য চোরাশিকারিদের কবলে পড়েছে। গড়ে বছরে ৫৫টি। ১৯৯৮ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'বছরের ৪০টি হাতিকে বিষপ্রয়োগ করে মারা হয়। ওই একই সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মারা হয় ২৭৯টি হাতিকে।

মানুষ মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দেয় বনদফতর। ফসল বা ঘরবাড়ি নষ্ট হলেও দেয়। উপরোক্ত সময় (১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে জানুয়ারি ২০১২) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে মৃত/আহত মানুষের জন্য ৯৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৬৬ টাকা, মৃত/আহত গবাদি পশুর জন্য ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ২১৩ টাকা, ফসল নষ্ট হওয়ায় ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার ৩৫টাকা, এবং ঘরবাড়ি নষ্ট হওয়ায় ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৯৫ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয় বন দফতর। ওই একই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে, মৃত/আহত মানুষের জন্য ৪৭ লক্ষ ৮১ হাজার ১৫০টাকা, মৃত/আহত গবাদি পশুর জন্য ১১ হাজার টাকা, ফসল নষ্টের জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮২২ টাকা এবং ঘরবাড়ি ভাঙার জন্য ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৪৮ টাকা।

কিন্তু, বন এলাকায় হাতির আক্রমণে মারা গেলে কোনও ক্ষতিপূরণ মেলে না। এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানা গেল আলিপুরদুয়ারের উত্তর পোরো বস্তিতে। সোনি রাভা স্বামীর সঙ্গে পোরো নদীতে গিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে। হঠাৎই একটা একোয়া হাতি (দলবিহীন একলা হাতি, প্রধানত পুরুষ) তাঁদের আক্রমণ করে বসে। স্বামী পালাতে পারলেও পালাতে পারেননি সোনি। গুরুতর আহত সোনিকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালে। বন দফতরই নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে পাঠান হয় শিলিগুড়িতে। সেখানেই মারা যান তিনি। মরদেহ পোস্টমর্টেমের পর পাঠান হয় মর্গে। এর পর মাসখানেক কেটে গিয়েছে, মর্গেই পড়ে রয়েছে দেহ। কারণ, আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িতে মৃতদেহ গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসার মতো অর্থ রাভা পরিবারগুলির অধিকাংশেরই নেই যে। এই সময়, হঠাৎই একদিন রাভা বস্তিতে এসে হাজির বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গ্রামের লোকজনদের নিয়ে গেলেন শিলিগুড়িতে। তার পর মৃতদেহ শনাক্ত করে ডোমের হাতে গুঁজে দিলেন হাজার দেড়েক টাকা, দেহ সৎকারের জন্য। কিন্তু, মৃতার পরিবার বন দফতর থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি। কেন? বন দফতরের এলাকায় জীব-জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। সেখানে মানুষকে 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবেই দেখা নিয়ম। বনবস্তির বাসিন্দা হলেও। গল্পটি শোনা, রাভা যুবক চন্দ্র রাভার কাছে।

কিস্টোন স্পেসিজ

তবে কি হাতি-মানুষের সংঘাত চলতেই থাকবে? এর কি কোথাও কোনও শেষ নেই? ১১০ কোটি জনসংখ্যার দেশে হাজার সাতাশ হাতির স্থান হতে পারে না? পুরাণ কিংবা মহাকাব্যের কথা বাদ দিয়ে যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব আলেকজান্ডারের অভিযান রুখতে মহাপদ্মানন্দ দু'হাজার হাতি নিয়ে মহড়া দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতিশালে ছিল

Ori-Plast®

সারা জীবনের সাথী

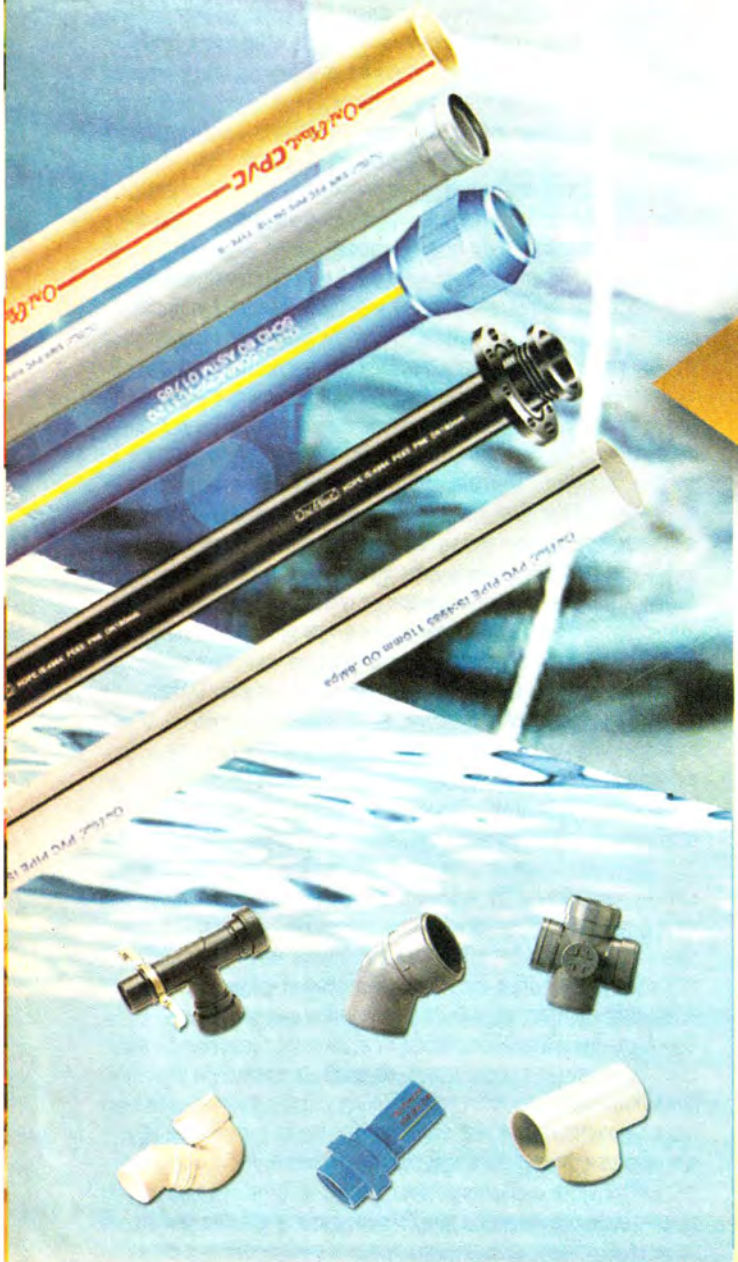

CPVC • uPVC • HDPE • SWR

পাইপস এবং ফিটিংস ও **Heavy Duty**

জলের ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারক

REGISTERED OFFICE : 40 Strand Road, Kolkata-700 001 Phs. : (033) 2243 3396/97 Fax : (033) 2243 2395
CORPORATE OFFICE : 9A, Wood Street, Kolkata-700 016 Phs. : (033) 2283 9054-58 Fax : (033) 2283 9059

ন'হাজার হাতি। শের শাহের ছিল পাঁচ হাজার। বাদশা আকবর হাতি ভালবাসতেন, তাঁর আমলে সারা দেশে রাজা-রাজরা, জমিদারের হাতিশালে কিংবা মন্দিরে হাতি ছিল প্রায় ৩২ হাজারের মতো। জাহাঙ্গিরের সময় যা বেড়ে দাঁড়ায়, এক লক্ষ ৩২ হাজারে। বাদশা আকবর তো প্রতি সপ্তাহে কোনও যোগ্য বক্তিকে একটি হাতি দান করতেন। ভারতীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, হাতি দান, সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উদ্ধৃত করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেই প্রথম হাতির জন্য অভয়ারণ্য গড়ার প্রচেষ্টা শুরু। হাতিকে হত্যা করলে ছিল মৃত্যুদণ্ডের বিধান। শিশু, মাদি কিংবা মাকনা হাতি ধরা ছিল নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের যেমন প্রতীক হাতি, তেমনি হিন্দু ধর্মে সে গনেশ দেবতা, দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা জগদ্ধাত্রীর বাহন। দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে হস্তীবিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে। যার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, পালকাপ্যের 'গজশাস্ত্র' কিম্বা নীলকান্তের 'মাতঙ্গলীলা'। আজ সেখানে বুনো হাতির সংখ্যা, সরকারি ভাবে ২৭ হাজার থেকে ২৯ হাজার।

পরিবেশ ও অরণ্য বিষয়ক বিশেজ্ঞদের মতে, হাতি প্রকৃত অর্থেই নির্দেশক প্রজাতি। হাতিরা যদি জঙ্গলে ভালো থাকে, তবে বোঝা যাবে ওই প্রকৃতি সমৃদ্ধ। ভালো থাকতে হলে প্রয়োজন খাবার, জল, আশ্রয়। বিশেজ্ঞরা বলেন, হাতি এশিয়া মহাদেশের ক্রান্তীয় অরণ্যের 'কিস্টোন স্পেসিজ'। অর্থ্যাৎ, অরণ্যকে যদি একটি খিলান হিসাবে ধরি, তবে সেই খিলানটি দাঁড়িয়ে থাকার মুল অবলম্বন হল হাতি। যুথবদ্ধ হাতির পাল যে অঞ্চল দিয়ে যায়, সেখানে একদিকে যেমন, তাদের বর্জ্য সারের কাজ করে, বা তার মধ্যেই থেকে যায় ফলের বীজ, যা জারিত হয় হাতির পেটে। আবার বড় গাছ ফেলে দিয়ে গভীর অরণ্যে সূর্যালোক প্রবেশের পথ করে দেয় তারা। ফলত, নীচে ছোট ছোট গাছ, চারা, ঝোপ-ঝাড় তৈরি হয়। মরা গাছের কাণ্ড এবং ডালপালাও বহু কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, ব্যাঙ, ব্যাঙের ছাতার জন্ম ও বাসস্থান। এলিফ্যান্ট টাস্ক ফোর্সের বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, 'Elephas maximus is a keystone species in the Asian tropical forest. It can act as an umbrella or flagship for conserving biodiversity. Gajah can help save critical parts of the land mass that will be functional ecosystems representative of Asia's biomes. And also serve as a living library for science, store of genetic wealth and place where we can continue to learn how nature works.'

সেই পরিবেশটি কি রয়েছে? বক্সার বনবস্তির বাসিন্দা লাল সিং ভুজেলের এক অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ রয়েছে। যার ব্যাখ্যা করতে পারেন একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী। আমরা তাঁর কথাটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি। লাল সিং বলছিলেন, বর্ষার সময় হাতি একটু পাহাড়ের দিকে উঠে যায়। দেখা গেল, সেখানে তারা পাথর চাটছে। তা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন, সেটা নুন। মাংসাশী প্রাণী তাদের খাদ্য থেকেই শরীরে নুনের চাহিদা মেটায়। কিন্তু, তৃণভোজীদের নুনের চাহিদা মেটে কোথাও নোনা মাটি বা পাথর থেকে (রকসল্ট)। তো এবার পর্যটকদের জন্য বনের ভিতরে বাংলো হল, ওয়াচ টাওয়ার হল। সেখানে তৈরি হল 'সল্টলিক', অর্থ্যাৎ, তৃণভোজীরা জল খেতে আসবে, নুনও চাটবে। পর্যটকরা এখানেই মনের সাধ মিটিয়ে দেখতে পাবেন জংলি জানোয়ার, একদম প্রাকৃতিক পরিবেশে। লাল সিংয়ের মতে এখানেই কাল হল। এর পর সর্বত্র সল্টলিকগুলিতে ঠিকঠাক নুন পরলো না। হাতি গ্রামে হানা দিয়ে পেয়ে গেল সেই নুনের সন্ধান। তার পর অনেকসময় স্রেফ নুনের জন্যই ঘর-বাড়ি- মুদির দোকান ভাঙল হাতির পাল, উনুন ভেঙেও মাটি চাটল। হাতি কি শুধু নুনের জন্যই ঘর ভাঙে? আদিবাসী মহল্লায়, চা-বাগানে বাড়িতে তৈরি রাইস বিয়ার বা দেশি মদও হাতিদের পছন্দের তালিকায়। মিড ডে মিলের সাফল্য যেমন শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে এনেছে, তেমনই হাতিকেও। সংবাদপত্রের হেডলাইনে যদি পড়েন, হাতি বিদ্যালয়ের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে পড়েছে, নিশ্চিত জানবেন তারা মিড ডে মিলের চাল-ডাল-আলু-নুন খেয়ে গিয়েছে। অসমে যেমন শোনা গিয়েছে এমন খবর, তেমনই বাঁকুড়াতেও। আরও একটি কথা বলছিলেন লাল সিং। বলছিলেন, একসময় ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রচুর বেত হতো, যা ছিল হাতির বড় প্রিয় খাদ্য। আজ তার দেখা নেই। ইকরা নামে ঘাস হত নদীর তীরে কাদামাটিতে। একের পর এক বন্যা মাটির চরিত্র বদলে দিয়েছে। বালির নিচে চাপা পড়েছে নদীর তীর। হারিয়ে গিয়েছে ইকরা। তার উপর মুনাফার লোভে একদিন হেক্টরের পর হেক্টর স্বাভাবিক বন ধ্বংস করে লাগানো হয়েছে সেগুন গাছ (তবে, সেগুনের ছাল হাতির খাদ্যের মধ্যে পড়ে)। যার নীচে ঝোপঝাড়টুকুও হয় না। তবে তো বলা যায়, হাতি ভালো নেই, তাহলে ভালো নেই বনও। বনাঞ্চলের মানুষেরও তবে ভালো থাকার কথা নয়।

উন্নয়নের বলি : হাতি ও আদিবাসী

এ শুধু আমাদের রাজ্যের কথা নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরায় হাতিদের কোনও ভবিষৎ নেই, এ কথা বলেন বিশেষজ্ঞরাই। হাতি সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় 'টাস্ক ফোর্স' ২০১০ সালে তাদের রিপোর্টে পূর্ব ভারতের পরিস্থিত সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ তা এককথায় ভয়াবহ। 'খনি, বিশেষ করে খোলামুখ খনি হাতি সংরক্ষণে বড়সড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, ওড়িশার কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ, ঢেঙ্কানল, আঙুল ও ফুলবনিতে খনির কারণে জঙ্গল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ায় হাতির পাল পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ছে।'

উল্লেখযোগ্য, ২০০৮ সালে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের সমস্যা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছিল প্ল্যানিং কমিশন। ওই কমিটি তার রিপোর্টে জানিয়েছিল, খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে 'খনি প্রকল্পগুলির কারণে আদিবাসী মানুষদের বেঁচে থাকাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।'

আদিবাসী ও বন্য প্রাণীর সমস্যা সম্পর্কে এই তুলনামূলক তথ্য হাজির করে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রবল চাপে আদিবাসী ও হাতিরা তাদের চিরাচরিত ভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী ড. ওয়াল্টার ফার্নান্ডেজ একটি হিসাব কষে দেখিয়েছেন, ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি বাঁধ, খনি ও রেললাইন তৈরির মতো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য, ছ'লক্ষ মানুষ আড়াই লক্ষ হেক্টর জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। যার মধ্যে সাত লক্ষ হেক্টর বনভূমি। ফার্নান্ডেজ এ কথাও আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভারতে আদিবাসীরা মোট জনসংখ্যার ৮.০৮ শতাংশ, কিন্তু, বিতারিত মানুষের ৪০ শতাংশই আদিবাসী। ঠিক একইভাবে, হাতি সংরক্ষণ বিষয়ক 'টাস্ক ফোর্স' আমাদের দেখিয়েছেন, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত খোলামুখ খনির বৃদ্ধির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.০৬ শতাংশ, যেখানে ওইসময়ে ভূগর্ভস্থ খনি বৃদ্ধি পেয়েছে .০৭ শতাংশ হারে। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৬ সাল অবধি খনি প্রকল্প ৯৫ হাজার হেক্টর বনভূমি গিলে খেয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গে ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত যে ৮৮ জন মানুষ হাতির আক্রমণে মারা গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৬৭ শতাংশই আদিবাসী। দক্ষিণবঙ্গে ওই সময় মারা গিয়েছেন ৫১ জন। তাঁদের মধ্যে আদিবাসী মানুষ ছিলেন ৪৫ শতাংশ।

হাতির নুন চাটা নিয়ে লাল সিংয়ের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণের কথা আগেই বলেছি। ২০০২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আই জি ফরেস্ট এবং ডিরেক্টর, প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট, এস এস বিস্ত এক নিবন্ধে জানিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গে হাতিদের একটি অত্যন্ত প্রিয় সল্টলিক (যেখানে তৃণভোজি প্রাণী নুন চাটতে আসে।) ছিল, খোমানি বনাঞ্চলের রংপো-১ বিভাগের নকশালখোলা। ১৯০৭ সালে দার্জিলিং গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি নথিবদ্ধ করেছিলেন, একটি হাতির পাল জলপাইগুড়ির তন্ডু বনাঞ্চল এবং নকশালখোলার মধ্যে যাতায়ত করত। কালিম্পং পাহাড়ের পূর্বদিকে জলঢাকা নদীর এক উপনদীর তীরবর্তীতে ছিল ওই সল্টলিক। বিস্তের মতে, বনরক্ষার 'তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা'র শিকার হয়েছে এই স্থানটি। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিবন্ধে বনবিভাগের এক প্রবীণ আধিকারিক এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এ সি গুপ্ত'র ১৮৫৮ সালের এক পর্যবেক্ষণ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়েছেন। এ সি গুপ্ত জানাচ্ছেন, 'কয়েক প্রজন্ম ধরে খোমেনি বনাঞ্চালের সল্টলিক তৃণভোজী প্রাণীদের একটি আখড়া ছিল। ভুটান ও কালিম্পং পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তন্ডু বনাঞ্চলের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে তৃণভোজীরা এখানে আসত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত ওই সল্টলিকের শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধের ফলে বহু নিয়মকানুন শিথিল হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ। বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, তার

সংরক্ষণের বুনিয়াদি নীতি বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হল। বনের সুগম অঞ্চলগুলি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে শ্রমিকদের আবাসস্থল তৈরি করা হয়েছিল। নকশালখোলা সল্টলিকের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। খোমেনি বনাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে পশুদের বিচরণের এলাকায় বন ফাঁকা করে দেওয়া হয়। সল্টলিকের খুব কাছেই বড় এক অঞ্চল জুড়ে বন কেটে ফেলে বনবস্তি স্থাপন করা হয়েছিল।' ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

বাঁকুড়ার কোরা পাহাড়ের জলাশয়ে স্নান

এরাজ্যে হাতির ভবিষ্যৎ

উত্তরে

আমাদের দেশে হাতির বাসস্থানকে মূলত দশটি ভূভাগে ভাগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলি হল, ১. উত্তর-পশ্চিম ভূভাগ, ২. উত্তরবঙ্গ-গ্রেটার মানস ভূভাগ, ৩. কামেং-শোণিতপুর ভূভাগ, ৪. পূর্ব দক্ষিণ তীর (ব্রহ্মপুত্র) ভূভাগ, ৫. কাজিরাঙা-কার্বি আংলঙ-ইনর্টাকি ভূভাগ, ৬. মেঘালয় ভূভাগ, ৭. পূর্ব-মধ্য ভূভাগ, ৮. ব্রহ্মগিরি-নীলগিরি-পূর্ব ঘাট ভূভাগ, ৯. আন্নমালাই-নেল্লিয়ামপাথি-উচ্চ এলাকা ভূভাগ, ১০. পেরিয়ার-অগস্ত্যমালাই ভূভাগ। উত্তরপূর্ব, পূর্ব-মধ্য, উত্তরপশ্চিম এবং দক্ষিণভারত জুড়ে এই এক লক্ষ দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলেই রয়েছে ২৭ হাজার থেকে ২৯ হাজার হাতি। আমরা আলোচনার জন্য বেছে নেব আমাদের রাজ্যকেই যা দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত। এক, উত্তরবঙ্গ-গ্রেটার মানস ও দুই, পূর্ব-মধ্য ভূভাগকে।

উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ন'টি বনবিভাগ জুড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০টি হাতি রয়েছে। যা দেশের মোট হাতির এক শতাংশের সামান্য বেশি। বনভূমির আয়তন ৩০৫১ বর্গ কিলোমিটার বা রাজ্যের মোট বনভূমির ২৪ শতাংশ। যদিও, হাতির বাসভূমি ২২০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। তরাই-ডুয়ার্সের এই অঞ্চলের বনভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। যার মাঝে রয়েছে, চা বাগান, মনুষ্য বসতি, সামরিক বাহিনীর ছাউনি। এর মধ্যে দিয়েই হাতির চলাচল। টাস্ক ফোর্স জানাচ্ছে, তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ৮৫ থেকে ১০০টির বেশি হাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাদের মতে, মানুষ-হাতির মধ্যে অতিমাত্রায় সংঘাত এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। প্রধানত, বৈকণ্ঠপুর, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার বনাঞ্চলের খণ্ড চরিত্রের জন্য। ফলত, হাতিরা চা বাগান, গ্রাম, ফসলের খেত, সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে যেতে বাধ্য হয়, আর তার ফলে মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘাত বাড়ছে। টাস্ক ফোর্সের বিশেষজ্ঞদের মত, তিস্তা নদীর পাড় বরাবর মহানন্দা অভয়ারণ্য ও বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের মধ্যে হাতির করিডোর (যাতায়তের পথ) সংরক্ষণ করতে হবে। তার জন্য এখানকার বেআইনিভাবে তৈরি মানুষের বসতিগুলি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এছাড়াও উত্তর ডায়না ও রেহতি বনের মধ্যের করিডোরটি নতুনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তোস্তা ও তিতি বনের মধ্যে হাতিরা সহজেই যাতায়ত করতে পারে।

২০১০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার লাইনে সাতটি হাতির মৃত্যু হয়। ন্যারো গেজ থেকে ব্রড গেজে সম্প্রসারণই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ। কিন্তু, ২০০০ সালেই এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের পরিবেশপ্রেমী ও তাদের সংগঠনগুলি। ওই সালেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থার (ডবলিউ ডবলিউ এফ) তৎকালীন অধিকর্তা লে. কর্নেল শক্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় তিনি তাঁর আবেদনে কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছিলেন, 'মিটার গেজ লাইনটি শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে মহানন্দা অভয়ারণ্য, কালিম্পং ডিভিশনের অরণ্যাংশ, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এই লাইনের দু'পাশে বহু বন্যপ্রাণী যাতায়ত করে। ডবলিউ ডবলিউ এফ-ইন্ডিয়ার আশঙ্কা, ওই লাইনটি মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজ করা হলে লাইনে ট্রেনের সংখ্যা ও ট্রেনের গতি দুই-ই বেড়ে যাবে। ফলে বন্যপ্রাণীদের প্রাণহানির ঘটনাও বহুগুণ বেড়ে যাবে।' ২০০২ সালের ২০ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলার নিষ্পত্তি ঘোষণা করে। কেন না, পরিবেশ রক্ষা আইনে রেললাইন চওড়া করার বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে, হাইকোর্ট হাতিদের সুরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ২০০৪ সালে নতুন ব্রডগেজ লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আর সে বছরই ১৬ মার্চ মহানন্দা অভয়ারণ্যে একটি মাদি হাতি মালগাড়ির ধাক্কায় মারা যায়। এর পর ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সালের ২৫ জুন অবধি এই রেলপথে সাত বছরে ৩০টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন, মিটার গেজ লাইনে ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০২ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত (মিটার গেজ লাইনে হাতির মৃত্যুর যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে) ২৮ বছরে মারা গিয়েছে ২৭টি হাতি। অর্থাৎ, হাতির মৃত্যুর বাৎসরিক গড় সংখ্যাটি ব্রডগেজ হওয়ার পর চারগুণ বেড়ে গিয়েছে।

২০১০ সালে একসঙ্গে সাতটি হাতির মৃত্যুর পর বন ও রেলদফতরের তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা বেলিন্দা রাইট ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'উদ্ভট কাণ্ড-কারখানা ঘটছে। এত হাতি মারা যাচ্ছে, অথচ সরকার আমাদের কথাই শুনছে না।' গভীর দুঃখের সঙ্গে পার্বতী বরুয়া সেই সময় বলেছিলেন, 'একটা-দুটো-তিনটে নয়, সাত-সাতটি হাতি মারা গেল। আমার জীবনে এটা একটা সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। বাসস্থান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসায় ইতিমধ্যেই ওদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। ঘনঘন এই ঘটনা রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গৌরীপুর রাজবাড়ির সন্তান প্রয়াত প্রখ্যাত হস্তী বিশেষজ্ঞ প্রকৃতিশচন্দ্র বরুয়া'র (লালজি) সুযোগ্য কন্যা

পার্বতীদেবীর মতো অসম ও পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সের হাতিদের খুব কম মানুষই চেনেন।

দক্ষিণে

পূর্ব-মধ্য ভূভাগে দক্ষিণবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বেশি পত্রমোচী অরণ্য হাতির চিরাচরিত বাসস্থান। পালামৌ ও দলমা অভয়ারণ্য অঞ্চলে আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামার খনি, বনধ্বংস, ঝুম চাষ হাতির স্বাভাবিক বাসস্থানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্পের ক্যানালের জন্য সিংভূমের পোরহাট অরণ্য থেকে দলমা অভয়ারণ্যে হাতির আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে দলমা অভয়ারণ্যের সংযোজিত এলাকা বলেই ধরা হয়।

এক সময় সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দলমার হাতিরা নেমে আসত এই অঞ্চলে। বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এরা ফিরতে চাইছে না। শ'খানেকের বেশি হাতি এই অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়ায়। রাজ্যের জঙ্গলমহল খ্যাত এই অঞ্চলটিতে সামাজিক বনসৃজনের কারণে শালের বন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই বন হাতিদের আশ্রয় হয়ে উঠলেও, সে বনে তাদের পর্যাপ্ত খাবার কিংবা জল নেই। খাবারের জন্য তারা হানা দেয় গ্রামের পর গ্রামে, চাষের খেতে। সম্প্রতি ৪১৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ময়ূরঝরনায় একটি হস্তী-এলাকা স্থাপিত হলেও, তা যথেষ্ট নয়। মূলত, বাণিজ্যিক চরিত্রের এই বনাঞ্চলে কোনও সংরক্ষিত এলাকা নেই। ফলত, উত্তরের তুলনায় দক্ষিণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যে ঢের বেশি তা সরকারি পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত। বিগত দু'বছরে উত্তরবঙ্গে যেখনে ১৭৪৯ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে দক্ষিণবঙ্গে ওই একই সময়ে ক্ষতি হয়েছে ৬৩০৫ হেক্টর জমির ফসল। যা প্রায় সাড়ে তিনগুণ।

তবু এখানে হাতি আসে কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দলমার বনাঞ্চলের অবস্থার অবনতি যেমন একটি কারণ, তেমনি অন্য কারণটি হচ্ছে সামাজিক বনসৃজনের কারণে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলের উন্নতি। যদিও তা মূলত শালের জঙ্গল, তবু, এই জঙ্গল দিনের বেলায় হাতিদের আবাস হয়ে ওঠে আবার রাতে তারা বেড়িয়ে পড়ে খাবারের খোঁজে। এ কথা মনে রাখতে হবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া উনবিংশ শতাব্দীতেও হাতির একচেটিয়া আবাসস্থল ছিল। কিন্তু, একসময় সাফ হয়েছে জঙ্গল, তার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র হারিয়েছে মাটি, স্বাভাবিকভাবেই টান পড়েছে জলে। চলে গিয়েছে হাতিরাও। আবারও তারা ফিরে আসছে। ছড়িয়ে পড়ছে নতুন নতুন এলাকায়। জীববৈচিত্রের নিরিখে তবে তো সুখের কথা। কিন্তু, যদি খাবার জোগাড়ে বেরিয়ে, এক রাতে কোনও একটা হাতির পাল গ্রামে হামলা চালিয়ে, ঘর ভেঙে, চাষির জমিয়ে রাখা ধান-আলু, মুদির দোকানে হানা দিয়ে নুন, আবার ওই রাতেই হাইস্কুলের ভাঁড়ার ঘরের দরজা ভেঙে মিড ডে মিলের খাবার সাফ করে দেয়, মানুষ মারে তখন আর তা সুখের গল্প থাকে না।

বন দফতরের দাবি, ১৯৮৭ সালে প্রথম দেখা যাচ্ছে এমন এমন অঞ্চলে হাতি যূথবদ্ধভাবে ঢুকে পড়ছে যেখানে গত ১০০ বছরে তা দেখা যায়নি। বন দফতরের তথ্য আরও বলছে, প্রতিবছর দলমা পাহাড় থেকে আসা হাতির দল ধানের লোভে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বাঁশপাহাড়ি অঞ্চল হয়ে মাঠগোদা ও রানিবাঁধের জঙ্গলে আশ্রয় নিত। কিন্তু, ১৯৮৭ সাল থেকে দেখা গেল নতুন একটা প্রবণতা। হাতির পাল পূর্ব ও উত্তর পূর্বের দিকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র বাড়িয়ে চলছে। বিষ্ণুপুর, তার সংলগ্ন জয়পুরের জঙ্গল, গড়বেতা বা তালডাংরাতেও দেখা যেতে লাগল তাদের। সাধারণভাবে বিচরণ ক্ষেত্র প্রসঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ শচীকান্ত চক্রবর্তীর মত, 'বিচরণ এলাকার আয়তন নির্ভর করে বাসস্থান, খাদ্য ও জলের পরিমাণের উপর। এই উপাদানগুলির পরিমাণ যদি সীমিত হয়, তবে হাতি তার এলাকা ক্রমশ বাড়াবে। যথেষ্ট হলে ৩৫-৪০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যেই থাকবে। মানুষের কারণে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান বা হ্যাবিট্যাটে খারাপ প্রভাব পড়ায়, কোনও কোনও সময়, এই বিচরণ ক্ষেত্র বাড়তে বাড়তে ১৫০ থেকে ৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পর্যন্তও দেখা গিয়েছে।' একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির দৈনিক খাবার লাগে ২০০ থেকে ২৫০ কেজি। খাবার মতোই ঘর্মগ্রন্থীহীন এই প্রাণিটির জলের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দিনে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ লিটার। খাবার ও জল সংগ্রহ করতে তাকে প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। এ ছাড়াও জলে-কাদায় শরীর ডুবিয়ে বসে থাকতে খুবই পছন্দ করে তারা। গরমের অস্বস্তি দূর করতে কাদা ও ধুলো শরীরে ছড়ায়। অথচ, শাক-সবজি-ধান লুঠ করতে পারলে চার-পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই চলে। আর পুষ্টিও অনেক বেশি। একে তো অত খাবার ও জল জঙ্গলে নেই। আবার আর একটা দিকও বুঝতে হবে, শালের বাকল ছিঁড়ে তার নরম অংশ কিংবা শিমুল, জারুল, শিশুর বাকল খাওয়া, কিংবা খুঁজে পেতে বেল, কয়েত বেল, চালতা খাওয়া তো বেশ হাঙ্গামারই। আবার প্রিয় বেত-বাঁশ, নানা জাতীয় ঘাস উত্তরবঙ্গে থাকলেও দক্ষিণের জঙ্গলে তা কোথায়? স্বাভাবিকভাবেই হাতি ধানের জমি, মানুষের বসতিতে হামলে পড়ছে।

আশায় আশায়

১৯৯১-'৯২ আর্থিক বছরে শুরু হয় হস্তিপ্রকল্প বা প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট। এ ছাড়াও হাতি আজ আমাদের দেশে হেরিটেজ আনিম্যাল হিসেবে গণ্য। বেশ কয়েকটি বড় বড় এলাকাকে চিহ্নিত করে হাতির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা শুরু হয়। এ কথা যেমন সত্যি, হাতির সংরক্ষণে এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। তেমনি সত্যি, হাতির সংখ্যা বাড়ছে। বন দফতরের হিসেব অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে হাতির সংখ্যা ছিল ১৫,৬০০। প্রতি হাতি গণনা বৎসরে তা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ থেকে ২৯ হাজার। এ যেমন আশার কথা, তেমনি আশঙ্কা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে না। আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চান না ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর মতো হস্তী বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সংরক্ষণের কারণ প্রধানত চারটে: (১) নৈতিক, (২) নান্দনিক (৩) অর্থনৈতিক, (৪) বৈজ্ঞানিক। নৈতিকতা একটি মূল্যবোধের প্রশ্ন। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে মানুষ বিধ্বংসী ক্ষমতা অর্জন করেছে। নিজের প্রয়োজন বজায় রাখতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে জীবজগতের বহু অবলা প্রাণীর অবলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহপালিত জীব ছাড়া প্রায় সব বন্য জীবজন্তুর জীবন সঙ্কটাপন্ন। যা রয়েছে, তা এখন জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের নীতিগতভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, পশু-পাখি-কীটপতঙ্গের বাহারি রূপ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো বটেই, শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের মনোজগতেও বারবার ঢেউ তুলেছে। গল্প-কবিতায়-গানে তা চির অমর হয়ে রয়েছে। তৃতীয়তঃ 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও হে নগর,' বলে আমরাও তো প্রকৃতির কোলে মুখ লুকোতে চাই। আর এই নান্দনিকতায় মুগ্ধ হতেই, এ বছর ডুয়ার্সে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই রব। এই গ্রীষ্মে দার্জিলিঙে দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড়, এক দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং বোঝাই যায় বনভিত্তিক পর্যটন অর্থনীতি একটি বড় আয়ের পথ। সবশেষে আমরা বলতে চাই বিজ্ঞা কথা প্রকৃতিতে মানুষ ও জীবজগৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সেখানে রয়েছে শৃঙ্খলার প্রশ্ন। এই শৃঙ্খলা ভাঙলে চরম দুর্দশা ঘনিয়ে আসে। সবশেষে আমরা বলতে চাই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটি। তা হল জীবজাল ও জীববৈচিত্র্য। কীট-পতঙ্গ না থাকলে ব্যাঙ নেই, উল্টো দিকে ব্যাঙ শেষ হলে কীটপতঙ্গ, মশা-ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত। আবার সাপ মেরে শেষ করলে ফসলের জমিতে ইঁদুরের উৎপাত বাড়বে। জীবজাল ছিন্ন হলে, নষ্ট হয়ে যাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। আসলে আমাদের বুঝতে হবে, বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান আমরা দখল করেছি। ওরা বাঁচতে চায় বলেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ⌘⌘

তথ্যসূত্র:

দ্য রিপোর্ট অব দ্য এলিফ্যান্ট টাস্ক ফোর্স : কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, ২০১০

ডেভেলপমেন্ট অব এক্সট্রিমিস্ট অ্যাফেক্টেড এরিয়া, প্ল্যানিং কমিশন, ২০০৮

স্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ, এইটথ মিটিং, ২০১২

হাতির বই, ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

হাতি ও বনজঙ্গলের কথা, ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

এনভায়রন, ২০০২, উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা

এখন আরণ্যক, ২০১২, হাতি সংখ্যা

এ জাম্বো ইস্যু, রজত রায়, দ্য বেঙ্গল পোস্ট, ২০১১

বাইরে দূরে

ইন্টারেস্টিং বোরং

সুচরিতা সেন চৌধুরি

রাবাংলা ম্যাল

বোরং মনাস্ট্রিতে লামারা

ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিটের কটেজ

সময়টা হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়েছিল খাদের কিনারায়। যেখান থেকে ঘন জঙ্গলের হাতছানি আর মেঘের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া যায় অনায়াসেই। সামনের রাস্তা কখন যে উধাও হয়ে যাবে, বলা মুশকিল। কখনও কড়া রোদ আবার কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। রোদ-বৃষ্টির খেলার মাঝে আমি কখনও একা আবার কখনও একদল স্কুল ফেরত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নিজেও ছোট হয়ে যাওয়া। বর্ষার সিকিম হাসি-কান্নার এক অনন্য মিশেল। সিকিম শুনলেই মনটা উড়ু উড়ু। একলাফে ইট, পাথরের শহর ছেড়ে স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দিতে সেকেন্ডের অপেক্ষা। আমাদের বেড়ানোর গ্রুপটা ভাঙতে ভাঙতে এখন প্রায় ছন্নছাড়া। তাই এবার আর বেশিদূর যাব না। গ্যাংটকের হোটেলে বিশ্রাম আর এমজি মার্গে ঘুরে সন্ধে কেটে যাবে। আমি, মা আর রবি। আমার ভ্রমণের সবথেকে ছোট পরিবার। জুনের এক রাতে দার্জিলিং মেলের কামরা আমাদের পৌঁছে দিল নিউ জলপাইগুড়িতে। ওখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম এ এক অন্য ব্যথা। উফ, ভিড় কাকে বলে? পাগল না কি, এই ভিড়ে চারদিন গ্যাংটকে কে থাকবে? এনজেপি থেকে গাড়ি ঊর্দ্ধমুখী হতেই পরিকল্পনা বাঁক নিল অন্য রুটে।

দে মন পাড়ি নতুনের খোঁজে। এমন জায়গা গ্যাংটকের হোটেলকে বলতে চমকে উঠল। সেটা আবার কোথায়? আমরা বললাম দক্ষিণ সিকিম, রাবাংলার কাছে। অনেক খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা খবর দিলেন, সেখানে নাকি থাকার জায়গা নেই। গিয়ে ফিরে আসতে হবে। জায়গাটার নাম শুনবেন? 'বোরং'। কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বলছি একটুও বোরিং নয়। মন পাগল করে দেওয়া সবুজ, উজাড় করা প্রকৃতি, নতুন নতুন ছন্দে সকাল-বিকেল সুর তোলা নানা পাখি। বর্ষায় এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে জোঁকের দেখাও মিলবে। তবে মরশুমের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া বোরংয়ের পিকচার পোস্টকার্ডে আমার ছবি শুধুই মেঘের। কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে অক্টোবর থেকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ফুলের মধু খেতে উড়ে আসে নানা রঙের পাখি। এই বর্ষায় ওদের যাতায়াত একটু কম। ফুল নেই, তাই মধু খেতে ওরাও জড়ো হয় না। তা বলে আমাদের নিরাশ করেনি। রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখেছি ঝুটিওয়ালা ধূসর রঙের সেই ছোট্ট পাখিটাকে।

আমাদের কটেজের বারান্দায় যে লতানো ধুতরো ফুলের গাছটা ছিল ওখান থেকে সকাল-বিকেল উঁকি দিতে দেখেছি সরু লেজওয়ালা নীল-কালোর অনবদ্য মিশেলের সেই পাখিকে। ক্যামেরা তাক করলেই ধা। ওরা চঞ্চল, ওদের যায় না ধরা। আর আমরা, যারা বোরংয়ের নিঝুম প্রকৃতির মাঝে গিয়ে পড়েছি, ওখানে চঞ্চল মন শান্ত হয়ে যায়। দিন-রাত ছুটে বেড়ানো সাংবাদিকের শান্তির ঠিকানা হতেই পারে বোরং।

থাকার জায়গার সন্ধান পেতেই একটা রাত গ্যাংটকে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই দে পাড়ি

বোরং। গ্যাংটকের জিপ স্ট্যান্ড থেকে শেয়ার জিপে রাবাংলা। রাবাংলা পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সে অবশ্য লোকাল জিপে লোক ওঠা-নামা, মাল তোলা-নামানোর জন্য। দেরি হওয়ার সবথেকে বড় কারণ অবশ্য আরও একটা ছিল। মুষলধারে বৃষ্টিতে পাহাড়ের গায়ে গাড়ি আটকে সে এক বিপত্তি। চাকা ড্রেনে আর গাড়ির ছাদের মালপত্র আটকে গেল পাহাড়ের গায়ে। তারপর সবার উদ্যোগে তাকে উদ্ধার করে ফের চলা শুরু। শেষ পর্যন্ত রাবাংলা পৌঁছলাম বিকেল হয় হয়। রাবাংলা থেকে কোনও স্থানীয় গাড়ির দেখা নেই। স্থানীয় এক যুবক বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন। বোরং যাব শুনে সেই আমাদের নিয়ে চলল। তাঁরও বাড়ি ওইদিকে। অন্ধকার নামার আগেই সে আমাদের পৌঁছে দিল আমাদের আস্তানায়। নাম, ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিট। নামের মধ্যেই বন্য মাদকতা। সেই নতুন মাদকতার সন্ধানে আমাদের নতুন দিন শুরু হল বোরংয়ে।

ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিটের কটেজে পৌঁছে একটু গুছিয়ে নিতে নিতেই সন্ধে নেমে এল বোরংয়ের জঙ্গলে। গরম গরম চা-বিস্কুট দিয়ে কটেজের ব্যালকনিতে সন্ধেটা দারুণ শুরু হল। বৃষ্টি এল আকাশ কালো করে। বৃষ্টির তেজ বাড়তেই ঘরে ঢুকতে বাধ্য হলাম। হালকা ঠান্ডা জোরালো হল। কম্বলের তলায় বসে সোলারের টিমটিমে আলোতে আড্ডা চলল জমিয়ে। সেখানে বাঁ নেই। রাজনীতি থেকে খেলা। আমার পছন্দের বিষয় খেলা হলে রবির আবার রাজনীতি। মা-র আবার কোনওটাই পছন্দ নয়।

খেলা-রাজনীতির মারপিট থামিয়ে দিল রাতের খাবার। বৃষ্টির মধ্যেই গরম গরম ডাল, আলুভাজা, ডিমের ঝোল আর ভাত। দারুণ জমল রাতের খাওয়ার। রাতের পেটপুজো সাঙ্গ করে মা আর রবি সটান লেপের তলায় ঢুকে গেলেও আমার ঘুম এল না। অনেকটা সময় কেটে গেল কটেজের বারান্দায় বসে দূরের পাহাড়ের আলো-আঁধারির খেলা দেখে। পাহাড়ি বৃষ্টি আমার সব সময়ই ভাল লাগে। মাঝরাতের নিস্তব্ধতা বারবার ভেঙে দিয়ে যাচ্ছিল টিনের ছাদের বৃষ্টির সজোরে ঝরে পড়ার শব্দ। যখন ঘুম এল তখন পাহাড়ি মানুষদের ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই।

ভোর হল মুরগির ডাকে। ছোটবেলার গ্রামের দিনগুলি এবার ফিরে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য। পাখির ডাকে বেলা বাড়ল। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। সাইড সিন বলতে তেমন কিছু নেই এই গ্রামে। আসার সময় রাবাংলা শহর ছেড়ে বেরোতেই নতুন হওয়া ম্যাল রোড দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু নামা হয়নি। আগে যখন রাবাংলা গিয়েছিলাম তখনও এই ম্যালটা হয়নি। বিরাট বুদ্ধের মূর্তির পাদদেশ জুড়ে দু'পাক খেয়ে নামা সাজানো রাস্তার মোহে আবার বেরিয়ে পড়লাম। ওখানে অনেকটা সময় কাটল। রাস্তার ধার ধরে ছোট ছোট বসার জায়গা। মেঘেদের আনাগোনা রাস্তা জুড়ে। সেখানে বসে সময় হারিয়ে যায় অজানার উদ্দেশে। ড্রাইভারের তাড়ায় আবার চলার শুরু। আসার সময় যে খরস্রোতা ঝরনাকে আছড়ে পড়তে দেখেছিলাম সেখানে ক্ষণিকের বিরতি। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে মন ভরে দেখে নেওয়া বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা মনমোহিনী জলরাশিকে। এ ঝোরার কোনও নাম নেই। নামের দরকারও নেই। শুধু মন ভরে দেখা। ছলকে ওঠা জলের ছিটেয় নিজেকে ভিজিয়ে নেওয়া।

বর্ষার সিকিম ভয়ংকর সুন্দর। রাস্তা ভেঙে অনেক জায়গাতেই গাড়ি চলার মতো অবস্থা

বোরং মনাস্ট্রি

নেই। সেটাই পেরিয়ে যাওয়া চোখ বুজে। চোখ খুললেই বর্ষায় ভিজে ওঠা ঘন সবুজের হাতছানি। প্রকৃতি ভুলিয়ে দেয় সব ভয়কে। আবার এগিয়ে চলা। পথে দেখা পুরনো রালং মনাস্ট্রির সঙ্গে। তাকে পেরিয়ে গেলেই নতুন রালং মনাস্ট্রি। আকৃতিতে নতুনটা অনেকটাই বড়। বিরাট চত্বরে ছোট ছোট লামারা অদ্ভুত অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছে। মনাস্ট্রির পাশ দিয়ে বাঁক খেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তার পাশের সবুজ ঘাসের গালিচায় মন ভরে ঘাস খেতে ব্যস্ত একপাল গোরু। মনাস্ট্রির পিছনে কখন যে সূর্যিমামা ডুব দিয়েছেন মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে, টেরই পাইনি। তাই আর দেরি নয়। এদিকের শেষ কোথায় তার খোঁজে এগিয়ে চললাম। আমাদের ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিট পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল শেষের খোঁজে। যেখানে গিয়ে গাড়ি থামল সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটো ব্রিজ। একটা ঝুলন্ত তারের উপর কাঠের পাটাতন পাতা। পাশেরটার কাজ সদ্য শেষ হয়েছে। ইট, পাথর, সিমেন্টের প্রলেপ পড়েছে এই গ্রামের বুকেও। সেই ব্রিজ দিয়ে নাকি গাড়ি চলবে। ব্রিজ পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার গেলেই সেই শেষ গ্রামের দেখা মিলবে। তারপরই পাহাড় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে কয়েক হাজার ফিট নিচের খাদে। ভবিষ্যতে ব্রিজ করে উলটো পাড়ের পাহাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। দক্ষিণ সিকিমের এই গ্রামগুলিকে পরিণত করার কাজ চলছে জোরকদমে।

বোরংয়ের ইন্টারেস্টিং প্রকৃতির মাঝে দ্বিতীয় দিনটাও কেটে গেল কোথা দিয়ে। বন্য মাদকতার মধ্যে ঘরে ফিরলাম। সেই আমাদের ছোট্ট কটেজের উষ্ণতায়। কিন্তু তারপরও ঘরে থাকতে মন চায় না। রাত পোহালেই ফিরতে হবে। তাই যতটা সম্ভব বোরংকে মনের মণিকোঠায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেওয়া। শেষরাতের মেনুতে গরম ভাত আর দেশি মুরগির ঝোল। দারুণ জমল। সঙ্গে ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিটের মালিক মধুসূদনের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা। জানতে পারলাম কী করে একদিন ঘুরতে ঘুরতে এই গ্রামটাতে এসে পড়েছিলেন তিনি। প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গিয়েছিল বোরংকে। তারপর একফালি ছোট্ট ঘর থেকে এখনকার এই রিসর্ট। শোনালেন এখনই পুজোর বুকিং সাঙ্গ হয়েছে। আসতে আসতে বোরংকে চিনছে মানুষ। বাড়ছে লোকের আনাগোনা। এবার আমাদের জন্য নিমন্ত্রণ পাখি দেখার। রবি বলল, মার্চ মাস? ইয়ার এন্ডিং, অসম্ভব। আমার ওসব নেই। আমার প্রতিটি দিনই শুরু, যার কোনও শেষ নেই। নতুনের খোঁজে বেরিয়ে পড়া। প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রকৃতির মাঝে কয়েকটা দিন শহর থেকে দূরে। অপেক্ষা শুধু অফিস থেকে ছুটি পাওয়ার।

পরের সকালে আকাশের মুখ ভার করে। বোরং ছেড়ে ফিরে আসার বিষণ্ণতা। বিদায় জানালাম বোরংকে। ওই যে রাতে যে লোমশ কুকুরটি বারান্দায় বসে থাকত, ও আমাদের পিছু নিল অনেক দূর পর্যন্ত। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল গ্যাংটকের পথে। পাহাড়ের বাঁকে কখন যেন হারিয়ে গেল বোরং। আবার একটা বাঁক থেকে রাস্তা ঘুরতেই গাড়ির ড্রাইভার ডানদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল ওই যে বোরং। দূর থেকে ক্যামেরায় ধরা গেল না সুন্দরী বোরংকে। ⌘⌘

না— এমন তো কথা ছিল না। কথা ছিল আরাকু যাওয়ার। রাত্তিরে শোওয়ার পরও তো, ঘুমিয়ে পড়ার আগেও তো ঋতময় বলল, কালই টিকিট কেটে ফেলব বুঝেছ। দু'মাস আগে কাটতে হয়। ঘুম জড়ানো গলায় সুচিরা বলেছিল, ঠিক আছে। এখন ঘুমোও। সেই তো ভোর চারটে বাজতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বার জন্য ব্যস্ত হবে।

সেই মানুষটা সকাল ছ'টাতেও বিছানায় শুয়ে আছে দেখে ঘুম ভাঙা চোখে সুচিরা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে গায়ে হাত রাখতেই চমকে উঠল। এ কী— এ যে পাথর গা! ধড়মড় করে উঠে বসে ঠেলাঠেলি করেও কোনও সাড়া নেই। দরজা খুলে ছুটল একতলায়। এক মাদ্রাজি দম্পতিকে কিছুদিন হল ওটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র।

তারপর তারপর সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। একা একা কোথায় চলে গেল ঋতময়! ওকে একা রেখে সে তো একদিনের জন্যও কোথাও যায়নি। তাহলে তাকে একা রেখে দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল কী করে! কিন্তু ঋতময় ভেবেছে এবং তাকে ফেলে সত্যি সত্যি চলেও গেছে। কিন্তু সুচিরা কেন এটা কিছুতেই মানতে পারছে না!

খবর পেয়েই সিঙ্গাপুর থেকে ছেলে তুবুই, বউমা নয়না চলে এসেছিল। সুচিরাকে আর কিছু ভাবতে হয়নি। চার হাতে মাকে আগলে রেখে ওরা সবকিছু করেছে। কিন্তু সুচিরা শূন্য চোখে শুধু ঋতময়কে খুঁজেছে। তুবুই সেটা ভালই বুঝতে পেরেছে। ছোট থেকে ওর এটা বোঝা হয়ে গিয়েছে। বাবাকে ছাড়া মা যে এক পা-ও ফেলে না— এই নিয়ে তুবুই মায়ের পেছনে লাগতেও ছাড়ে না। সেই তুবুই করুণ চোখে মাকে দেখছে। বাবাকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে এনে যদি মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত তাহলে বুঝি ওর মন শান্ত হত। মাঝে মাঝেই তাই কারণে-অকারণে মাকে জড়িয়ে ধরছে। তুবুইয়ের মধ্যে দিয়েই মা বাবাকে একটু পাক।

সুচিরাও সেটা বুঝতে পারছে। ছেলের স্বভাব-প্রকৃতি তো বাবার কেটে বসানো। গলার স্বরেও আশ্চর্য মিল। বাবার মতোই কারুর কষ্ট সহ্য করতে পারে না। মায়ের দিকে তাকিয়ে নিজের কষ্ট চেপে রাখছে। কেন যে মানুষটা ওদের এমন করে কষ্ট দিল। কী করে ঘুমের মধ্যে চলে গেল! শুধু মনে হচ্ছে— কোথাও যায়নি। এই একটু বেরিয়েছে। এক্ষুণি ফিরে আসবে।

কাজকর্ম সব চুকে যাওয়ার পর তুবুই আর নয়না দুজনেই বলল, মা তোমারও প্লেনের টিকিট কাটছি। সুচিরা কেমন যেন চমকে উঠে বলল, কেন? তোর বাবাকে ছেড়ে এক্ষুনি আমি কোথায় যাব? জলভরা চোখে দুজনেই মুখ নিচু করল।

এরপর আর তো কিছু বলার থাকে না। ছেলে-বউমা দুজনেরই অফিস আছে। ওদের তো যেতেই হবে। আটকে রাখার কথা সুচিরাও ভাবে না। ছেলে তো সেই পড়ুয়া অবস্থা থেকেই বাইরে বাইরে। ঋতময়ের বদলির চাকরি বলে হস্টেলে থেকেই ছেলের পড়াশুনো। ছেড়ে থাকার অভ্যাস তো সুচিরার সেই তখন থেকেই আছে। শুধু এবার যেন কেমন একটা অসহায় বোধ হচ্ছে। এতদিন যা কখনও হয়নি। হওয়ার দরকার পড়েনি।

ওরা যাওয়ার আগে রান্নার লোক পারুলকে মাইনেপত্র বাড়িয়ে মায়ের কাছে দিন-রাত্তির থাকার ব্যবস্থা করে গেছে। শুধু সকাল দশটা থেকে বারোটা আর একটা বাড়িতে যেমন রান্না করতে যেত তেমনি যাবে। এসব ভাবনা সুচিরার মাথায় আসেইনি। ওরা ঠিক এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সুচিরা নিজেকে এখনও একা ভাবতেই পারছে না।

তুবুইরা চলে যাওয়ার পর সুচিরা কেমন যেন আশ্চর্যভাবে ঋতময়ের উপস্থিতি টের পেতে লাগল। দিনে-রাত্তিরে যখন তখনই এটা ঘটতে লাগল। হঠাৎ মনে হয়, ওই তো ব্যালকনির চেয়ারে ঋতময় বসে আছে। কখনও মনে হয় শোওয়ার ঘরের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গেল। রাত্তিরে তো প্রায় সময়ই মনে হয়, পাশের বিছানায় ঠিক আগের মতো চুপটি করে শুয়ে আছে। ওই তো পাশ ফিরল। জোরে শ্বাস নিল। আর আছে সিগারেটের গন্ধ। অনেকদিন তো ওটা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল ঋতময়।

বাড়িতে বহুদিন সে গন্ধ আর নেই। নিচের তলার ভদ্রলোকও সিগারেট খান না। হঠাৎ কোথা থেকে সেই গন্ধ আসে!

এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুচিরা সেটা জানে। এটা তার মনেরই ভুল। কিন্তু এত ভুল হয় কেন— তার কোনও ব্যাখ্যা সুচিরার কাছে নেই। তার শুধুই মনে হয়, ঋতময় আছে। ওর সবটুকু অনুভবের জগতে নিবিড় হয়ে ওকে ঘিরে আছে। এই বয়সেও ঋতময়ের কিছু কিছু অভ্যেস প্রথম দিনগুলোর মতোই ছিল। পেছন থেকে টুক করে ওর খোঁপাটা খুলে দিয়ে চলে যাওয়া। এখনও হঠাৎ খোঁপাটা খুলে গেলে সুচিরা চমকে উঠে পেছনে ঘুরে তাকায়। জায়গার জিনিস জায়গায় না রাখা ঋতময়ের বাঁধা অভ্যাস ছিল। এখন তো ও নেই। তাহলে মাঝে মাঝে অমন উলটো-পালটা করে কে! পারুল এসব জিনিসে হাত দেয় না। তাহলে? এই তাহলের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যুক্তি-তর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে চায়ও না সুচিরা। ওগুলো ঋতময়ের হয়ে একান্ত তারই থাকুক।

কোল্ডফিল্ডের উঁচুতলার অফিসার ছিল ঋতময়। নানা জায়গায় বদলি— কাজের চাপও ছিল খুব। তবুও দুটি জিনিস নেশার মতো ছিল। বইপড়া আর বেড়ানো। সুচিরারও ওই দুটিতেই আনন্দ। নিত্যদিনের সংসারের বেড়াজাল খুলে সম্পূর্ণ আর একটা জগতে পৌঁছে যাওয়া। সবসময় বলত— রিটায়ার করার পর আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু সে কথা তো রাখল না ঋতময়। রিটায়ারমেন্টের পর দুটো বছরও তো কাটল না। কোথায় একা একা বেড়াতে চলে গেল সুচিরাকে ফেলে। শেষবার পাঁচমারিতে থাকার সময় একদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, আচ্ছা আমাদের দুজনের কেউ একা হয়ে গেলে এই বেড়ানোর কী হবে! সুচিরা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, অমন অদ্ভুত চিন্তা আমাকে যেন করতে না হয়। ঈশ্বর কি সেদিন ওপর থেকে হেসেছিলেন? নাকি ঋতময়ই তাকে পরীক্ষা করেছে।

খাবার টেবিলে বিকেলের চা দিয়ে পারুল ডাকছে। সুচিরা টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, এ কী এক কাপ কেন? পারুল একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সত্যি কেন যে সুচিরার মনে থাকে না— এখন থেকে কোনও কিছুই আর দুটো নয়। একটা— শুধু একটা।

দেখতে দেখতে আটমাস কেটে গেল। যদিও দিন-তারিখ-বারের আর খুব একটা দরকার হয় না সুচিরার। ছেলের জন্মদিন, বউমার জন্মদিন, ওদের বিয়ের দিন, শুধু এই ক'টি দিন যাতে ভুলে না যায় তার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে সুচিরা। দেখলেই মনে পড়বে। তাদের দুজনের দিনগুলো ভুলে যেতে চায় সুচিরা। মনে পড়লে বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে অ্যালবামগুলো নিয়ে বসে একা ঘরে। দেখতে পারে না বেশিক্ষণ। হু হু কান্নায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। কোনও কারণে কখনও সুচিরার চোখে একটু জল দেখলে ঋতময় অস্থির হয়ে পড়ত। আর আজ! অশ্রুজল বোধহয় জমা হয়ে থাকে ঝরার অপেক্ষায়।

নিচের তলার মাদ্রাজি দম্পতি নিয়মিত খবরাখবর করেন। স্বামী নারায়ণন, স্ত্রী শুভশ্রী। ওদের একমাত্র ছেলে খড়্গপুর আইআইটিতে পড়ে। শুভশ্রী মাঝে মাঝেই এসে অনেকক্ষণ বসে গল্প করে যায়। একদিন অনেকগুলো ছবি হাতে এল। ওঁর ছেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আরাকু বেড়িয়ে এল। সেখানকার সব ছবি। মন ভরে যায় অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভায়। মুগ্ধ হয়ে ছবি দেখতে দেখতে সুচিরা ঋতময়ের সঙ্গে আরাকু ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শুভশ্রী চলে গেল। কিন্তু আরাকুকে রেখে গেল সুচিরার মনের মধ্যে। মন শুধু ঘুরে ফিরে আরাকুর ভ্যালিতে ঘুরে বেড়ায়।

তুবুইকে একদিন ফোনে বলেই ফেলল, আরাকু যেতে খুব ইচ্ছে করছে রে। কিন্তু কীভাবে যাব? তুবুই বাবা-মার আরাকু বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা জানত। ঋতময়ই ছেলেকে বলেছিল। মায়ের মনে হঠাৎ আরাকুর প্রতিক্রিয়ার পেছনে যে কোনও একটা কিছু কাজ করছে সেটা তুবুই বুঝতে পারল। সুচিরাকে আশ্বস্ত করে বলল, ঠিক আছে আমি দেখছি। ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে ভাল ব্যবস্থা কী আছে দেখি।

সিঙ্গাপুরের নামকরা বেসরকারি কোম্পানির ম্যানেজার বোধিরূপ বসু মানে সুচিরার তুবুই মাস দুয়েকের মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলল। কলকাতার একটি বিশ্বস্ত ট্যুরিজম সংস্থা বয়স্কদের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক এবং সুস্বাচ্ছন্দ্যকর ভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকে। খরচাটা বেশি হলেও একেবারে নির্ভার হয়ে নিশ্চিন্ত ভ্রমণ। একা মানুষের পক্ষে এমন ব্যবস্থা সত্যিই লোভনীয়।

সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর সুচিরা ভেতরে ভেতরে কেমন অস্থির হয়ে উঠল। এ পর্যন্ত কোথাও কখনও একা কোথাও যাওয়ার দরকারই তার হয়নি। একা বেড়াতে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোথাও যাওয়ার সময় ইদানীং ঋতময় নিজের জিনিসপত্র আলাদা ছোট স্যুটকেসে গুছিয়ে নিত। আর বারবারই সুচিরাকে বলত, লাগেজ বাড়িও না। কোথাও যদি কুলি না পাওয়া যায় তখন তো তোমাকে আর লাগেজকে টানতে হবে আমাকেই। না— এবার আর টানাটানির কথা ভাবতে হবে না। লাগেজ সহ নিজেকে শুধু সঁপে দেওয়া। ভাববার লোকেরা সব কিছু ভাববেন।

সব কিছুই স্বস্তিজনক। তবু অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে কেন সুচিরার মনে! বেড়াতে যাওয়ার আগে যে মানুষটা সারাক্ষণ পেছনে লাগত— সেই মানুষটাই যে আজ পিছনে নেই। তাই বুঝি এত অস্বস্তি। যাওয়ার আগে কত উত্তেজনা, আলোচনা। কিছুই তো আর নেই। তার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকত, সেটাই তো আজ হারিয়ে গেছে। কী দরকার ছিল তাহলে এই যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার। না গেলেই তো হত। এ বাড়ির সর্বত্র তো ঋতময় ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে। সে সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিন— মাস— বছর পার করে দিলেই তো হত। কিন্তু তাও তো হওয়ার নয়। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কী একটা অদৃশ্য টানে সুচিরা যাওয়ার জন্য অস্থির হয়েছে। পথের শেষে কিছু কি, কেউ কি অপেক্ষা করছে তার জন্য। সুচিরা জানে না। কিন্তু ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করছে।

তুবুই রোজ রাত্তিরে একবার ফোন করে। বাইরে থাকলে এটা ওর কোনওদিন ভুল হয় না। আগে ঋতময় ঠিক সময় ফোনের কাছাকাছি থাকত। এখন আর কেউ বলবে না, নাও এখন অন্তত আধ ঘণ্টা আমার ছুটি। ছেলের কাছে প্রাণভরে যত নালিশ আছে জানিয়ে দাও। এসব কেস তো আর অন্য আদালতে ওঠে না। সুচিরাও জবাব দিত— একটাও মিথ্যে কেস নয়। কারণ প্রত্যেকটাতেই তুমি হেরে যাও। আমি তো আর জজসাহেবকে ঘুষ দিয়ে জিতে যাই না। অন্য পক্ষের আড়ালেও বক্তব্য রাখি না।

দশটা বাজতে চলেছে। এবার তুবুইয়ের ফোন আসবে। ফোনের সামনে যে চেয়ারটায় ঋতময় বসত, কথা বলত, তারপর সুচিরাকে ছেড়ে দিত। এখন ওটার পাশে ছোট একটা মোড়ায় বসে কথা বলে সুচিরা। মাঝে মাঝে চেয়ারের গদিটায় হাত বুলিয়ে দেয়। মনে হয় যেন ঋতময়ই বসে আছে, হাসছে মৃদু মৃদু। আরাকু যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। ফোনে তাই নানা নির্দেশ আর সাবধানতা। সুচিরা বুঝতে পারে ছেলে এই সময় বাবার অনুপস্থিতি খুবই ফিল করছে। নিজে সঙ্গে যেতে পারছে না। তাই কোথায় যেন একটা ওর কিন্তু কিন্তু বোধ। সুচিরা নিজেকে জোর করে শক্ত রেখে ছেলেকে চিন্তা করতে বারণ করে। এই সময় সুচিরা নিজেকে ঋতময়ের জায়গায় বসিয়ে কথা বলে। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়।

আজ ফোন-পর্বের পর বিছানার কাছে এসে একটু অবাক হল সুচিরা। চাদরটা একটু কুঁচকে গেছে যেন। সুচিরা কি একটু আগে ওখানটায় বসেছিল! মনে করতে পারছে না তো। কে জানে হয়তো তাই হবে। আজকাল বড় ভুলো মন হয়েছে। সবকিছুই মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলে যায়। সারা দিন-রাত্তিরে তিনবার ওষুধ খেতে হয়। এটা মনে রাখতেই হয়। আগে এটা ঋতময়ই মনে করিয়ে দিত। এখন মনে রাখার জন্য নানা কায়দা-কানুন করতে হয়েছে। সবকিছু মনে রাখাটাই এখন সবচেয়ে বড় মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুভশ্রীকে নিয়ে একবার একটু গড়িয়াহাট যেতে হবে। ঋতময়ের জন্য যে জহর কোটটা বোনা শুরু করেছিল— ওটা শেষ করে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে একটা গোলা লাগতেও পারে। কিনে নেওয়াই ভাল। নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। ওটার মধ্যেও তো ঋতময়ের স্পর্শ আছে। কতবার পিঠে ফেলে মাপ দেখেছে। ঋতময় মজা করে বলেছে, আমার পিঠটা তো রোজ রোজ বেড়ে-কমে যায় না। একটা মাপের ফিতে দিয়ে মেপে রাখলেই তো কাজ সহজ হয়ে যায়। যায় তো অনেক কিছুই। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট সুখকে যে তাতে ধরে রাখা যায় না, সেটা বোঝে ক'জন। কেনা সোয়েটার পরতে

ভালবাসত না ঋতময়। বিয়ের পর থেকে সুচিরা যা বুনে দিয়েছে তাই পরেছে। সুচিরার হাতের বোনারও অবশ্য প্রশংসা আছে।

আজকাল আর সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার কোনও তাড়া নেই সুচিরার। ব্যালকনিতে বসে চা খেতে খেতে দরকারি-অদরকারি হাজার কথার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘুম ভেঙে গেলেও তাই চুপচাপ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে সুচিরা। পারুলও ওঠার পর সকালের চা তৈরি করে। না ওঠা পর্যন্ত সংসারের অন্য কাজ সারতে থাকে। সুচিরা মনে মনে বলে— তুবুইরা এই ব্যবস্থাটা ভালই করেছে। তবু তো ঘরে একটা মানুষ আছে। মানুষ একা থাকার জন্যে তো আর সংসার বাঁধে না। হঠাৎ চোখ গেল আলমারির পেছনটায়। ওখানে একটা ব্র্যাকেটে ঋতময়ের শেষ পরে থাকা পাঞ্জাবিটা এতদিন ধরে ঝুলে আছে! আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে হ্যাঙারটা নামাল। পকেটে ভারী কী একটা। হাত ঢুকিয়েই অবাক সুচিরা। ঋতময়ের আলমারির চাবি। অনেক খোঁজা হয়েছে তখন— কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ক'দিন নামিয়ে ঋতময় কীসব কাজ করছিল। সেগুলো সব টেবিলের বড় ড্রয়ারে ছিল। তখন যা যা দরকার তুবুই তা পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিল ড্রয়ারটা লক করে রাখ। আলমারির ব্যাপারটা ফিরে এসে আমি দেখব। সুচিরা তারপর চাবির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ঋতময়ের সব কাজ অসম্ভব গোছানো। ফাইল করে, আলাদা আলাদা করে ওপরে সব লেখা আছে কোনটা কী। কাজ করার সময় বলত, আমি না থাকলে তোমার বুঝতে কোনও অসুবিধে হবে না। সুচিরা অবশ্য এসব ফাইল কোনওদিন ছুঁয়েও দেখেনি। মনের মধ্যে কেমন নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল— ওসব ওর কোনওদিনও দেখার দরকার পড়বে না। দেখতে হয়নি। তুবুই সব গুছিয়ে রেখে গেছে। এরপর যা করার এসে করবে। ঈশ্বর সবকিছু কেড়ে নেন না। নিজের অজান্তেই সুচিরা হাত দুটো কপালে জোড় করে। এবার সব আলমারিতে তুলে দিলেই হবে। পাঞ্জাবিটা বুকের কাছে ধরা ছিল। এতদিন হয়ে গেছে— তবু পাঞ্জাবিটায় ঋতময়ের গায়ের গন্ধ। পাঞ্জাবিটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে সুচিরা ভাবে— ধুলে তো গন্ধটা চলে যাবে। ঠিক আছে নিজের হাতে হালকা করে ধোবে। গন্ধ একেবারে চলে যাবে না নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি ওটা ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে ঢুকিয়ে দিল। ওখানে কেউ হাত দেবে না। এখন এটা ওর একান্ত গোপনীয়। এইসব করতে গিয়ে মুখের চেহারাটাই কি একটু উত্তেজিত হয়ে গেল? পারুল চা নিয়ে ঘরে ঢুকে ওর মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল। সুচিরা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাজারে কিছু আনতে হবে কি না। অন্যদিন পারুলই ফিরিস্তি দেয়। সুচিরা এখন এই মুহূর্তে তার কাছে পারুলের বেশিক্ষণ উপস্থিতি চাইছে না। তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে বিদায় করল। পাঞ্জাবি-চাবি সবকিছু ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে হবে। আবার ভুলে গেলেই মুশকিল। ভুলো মন নিয়েই তো যত জ্বালা।

যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। স্যুটকেশ যেটা নিয়ে যাবে সেটা সামনে এনে রেখে মনে করে করে এক একটা জিনিস প্রথমে ফেলতে হবে। তারপর গোছানো। বড় স্যুটকেশটাই নেবে। শুধু একার জিনিস নয়। ঋতময়েরও দু-চারটে জিনিস সঙ্গে থাকবে। তাছাড়া, এবার তো আর ঋতময় সঙ্গে থাকছে না। কিছু ভুলে গেলে ওটা আনা হয়নি, বাইরে গেলে একটু খুঁজে এনে দিও— এসব কাকে বলবে? আবার চোখে জল আসে কেন?

সংস্থার গাড়িই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে থাকা। পারুল থাকবে ওপরতলায়। নিচে তো শুভশ্রীরা আছেই। শোবার ঘরটা শুধু বন্ধ করে যাবে। আর সবকিছু খোলাই থাকবে। শুভশ্রী মাঝে মাঝে ওপরে এসে একটু তদারকি করে যাবে বলেছে। তাতে সুচিরা আরও নিশ্চিন্ত। দিন দশেকের তো ব্যাপার। তবু এমন একা তো এ পর্যন্ত যায়নি। সবকিছু ঋতময়ই দেখেছে। এবার নিজে সব করতে গিয়ে শুধু মনে হচ্ছে— কিছু ভুল হল না তো!

যাওয়ার দিন সকাল থেকে মনটা ভারী ভার হয়ে গেল। ঋতময়ের ওপর একটা বোবা অভিমান ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। স্যুটকেশের ভেতরে সুচিরার সবকিছুর সঙ্গে ঋতময় জড়িয়ে রইল। বাইরে— সুচিরা একা। একটা ছোট ব্যাগে হাতের কাছের দরকারি জিনিস ভরা রইল। ওটা সুচিরা নিজের কাছেই রাখবে। ব্যাগটা ওজনে হালকা। ভারী নজরকাড়া আর অনেক জিনিস দিব্যি ঢুকে যায়, ভার হয় না। বউমা নয়না ওটা ওর জন্য পছন্দ করে কিনে এনেছিল। মেয়েটা বড় ভাল। খুব খোলা মনের। আদর দিতে জানে, নিতেও জানে। সুচিরা জানে না, নিজের মেয়ে এর চেয়েও বেশি আপন হয় কিনা।

দুপুর সোয়া একটার করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বারোটার মধ্যেই সব এক জায়গায় জমা হয়ে আধঘণ্টা আগেই ট্রেনে উঠে পড়া হল। সবশুদ্ধ বারোজন। একজোড়া দম্পতি। সবাই বেশ সম্ভ্রান্ত এবং পরস্পর পূর্বপরিচিত। সুচিরাই নবাগত। সুচিরা ঘরও নিয়েছে ডবলবেড। তুবুইকে সেটাও বলেই দিয়েছিল। হঠাৎ করে কারুর সঙ্গী হওয়াটা সুচিরার ধাতেই নেই। ম্যানেজার সবাইকে নির্দিষ্ট বার্থে গুছিয়ে দিলেন। সুচিরার লোয়ার বার্থ। ওর ওপরের বার্থে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক নীলেশ মুখার্জি। ম্যানেজার রঞ্জিত সিনহা সুচিরার প্রতি প্রথম থেকেই বিশেষ নজর রেখে চলেছেন। সুচিরা বুঝল, তুবুই বিশেষ করে কিছু বলে দিয়েছে।

ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বসার পর একটু একটু করে আলাপ শুরু হল। সুচিরার উলটো দিকে একজোড়া দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী দুজনের পঁয়ষট্টির মধ্যে বয়েস। স্ত্রী এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। ভদ্রলোক রেলের বড় অফিসার ছিলেন। স্ত্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতেন। রিটায়ার করেছেন।

নীলেশ মুখার্জিও ষাট পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু এখনও এক্সটেনশনে আছেন। সংসার করেননি। কিন্তু মানুষজন ভালবাসেন। এটা জানিয়ে দিলেন সুচিরাকে। যেহেতু নতুন আলাপ। সামনের বার্থে বসা মিসেস চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরও জেনে রাখুন, উনি অসম্ভব পরোপকারী বন্ধুবৎসল মানুষ। আমরা তো সব সময় ওঁর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি।

দুপুরের পর থেকেই টুকটাক চা-কফি খাওয়া চলছিল। নীলেশ ওপরের বার্থে উঠে পড়ার ব্যবস্থা করছিলেন। সুচিরাই ওঁকে বসতে বলে বলল, আমি দিনেরবেলা শুই না। আপনি নিশ্চিন্তে গুছিয়ে বসুন। ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে দুটি বই আর একটা লম্বা খাতা বার করলেন। বই দুটি— গীতাঞ্জলি আর Song Offerings। খাতা খুলে কী সব নোট করতে শুরু করে দিলেন। এইসব লোকদের প্রতি সুচিরার একটু বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এঁদের নিজস্ব একটা জগৎ থাকে। চট করে সেই জগতে ঢুকে যান। পারিপার্শ্বিক কোনও কিছু অসুবিধাই এঁদের বিঘ্ন ঘটায় না। নিজের অধ্যাপক-লেখক ছোটমামার প্রতি সুচিরার ছোটবেলা থেকেই আলাদা একটা ভালবাসা ছিল। খুব সম্প্রতি ছোটমামা তাদের ছেড়ে গিয়েছেন। অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

রাত আটটার মধ্যেই সবাইকে ডিনার সেরে শুয়ে পড়তে বলা হল। খুব ভোরে নামতে হবে। পৌনে ন'টার মধ্যেই সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ। সংস্থার লোক এসে সবার বিছানা তৈরি করে দিয়ে গেল। নীলেশ ওপরে উঠে যাওয়ার আগে সুচিরাকে বললেন, কোনও অসুবিধে হলে আমাদের ডাকবেন। কোনও সংকোচ করবেন না। এখন আমরাই আপনার আপনজন। সুচিরার ভারী ভাল লাগল। এত সহজ সরল আন্তরিকভাবে ভদ্রলোক কথাগুলো বললেন, যে বুকের ভেতরটা আবার ঋতময়ের জন্য টনটন করে উঠল।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে রাতটা এগিয়ে চলল। পুরনো দিনের নানা ঘটনা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আনাগোনা করছিল। তারই মধ্যে মনে হল— সংসারে সব মানুষেরই কিছু না কিছু বেদনা আছে। সে একাই দুঃখী নয়। নীলেশের বন্ধু সমরেন্দ্র বসু এই দলে আছেন। হাসিখুশি আলাপী মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে মনেই হবে না, ভেতরে ওঁর কত বড় দুঃখ ঢাকা আছে। দুপুরেই আলাপ হয়েছে। অনেকক্ষণ গল্প করেছেন। তারই মধ্যে ওঁর জীবনের কথাও একটু জানা গেছে। বছর দুয়েক হল উনি স্ত্রীকে হারিয়েছেন। একমাত্র মেয়ে। ডাক্তারিতে সবে ভরতি হয়েছে। স্ত্রীর প্রবল উৎসাহেই মেয়ের এই লাইনে আসা। কিন্তু সেই খবরটুকুও জেনে যেতে পারেনি। ক্যানসারের নির্মম থাবা তার আগেই প্রাণটুকু কেড়ে নিয়েছে। ঘটনাটা সুচিরাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।

ভোর চারটেয় ম্যানেজার কামরায় এসে সবাইকে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে বললেন। ভোর ভোর আমাদের নেমে পড়া। সবাই একটু ব্যস্ত হল। চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল সবাই গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত।

ভোরের আধফোটা আলোতেই নেমে পড়া হল বিশাখাপত্তনমে। পনেরো জনের একটা ছোট লাক্সারি বাসে সোজা চলে যাওয়া হবে ঋষিকোণ্ডায়। ওটাই মূল আস্তানা। ওই বিচটাই সবদিক থেকে সেরা। ওখান থেকেই তারপর নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি তো আছেই।

সমুদ্রের ওপরেই বিশাল রিসর্ট। দেখেই ভাল লেগে গেল সুচিরার। শুধু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই নয়— ঘর থেকেও সমুদ্র দেখা যায়। সত্যি সত্যি ঋষিকোণ্ডা অসাধারণ। এখানেই তো তাদের দুজনের একসঙ্গে আসার কথা ছিল। কথা রাখেনি ঋতময়। এই সংসারে সুচিরাকে একলা করে দিয়ে কোন অজানা রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। নিজের ডাবল বেডের ঘরটায় ঢুকে ভাল করে সবকিছু লক্ষ করল। না, নিপুণভাবে ব্যবস্থিত। কিছুই বলার নেই। আগে আগে ঋতময়ের সঙ্গে যেখানেই গেছে, ঘরে ঢুকেই নিজের শোবার খাটটা পছন্দ করে ফেলেছে। শুয়ে শুয়ে বাইরেটা দেখতে সুচিরা ভীষণ ভালবাসে।

ঋষিকোণ্ডার প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কোনও মানুষের মন ভরিয়ে দেবে। একদিকে সবুজ পাহাড়— অন্যদিকে সামুদ্রিক ঝাউয়ের সারি। ভারি অন্তরঙ্গ। চারপাশ ঘিরে ছবির মতো সব দৃশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেদিকে তাকাও— শুধুই ভাললাগা। পাখির ঝাঁক, অল্প কিছু মানুষ, চায়ের দোকান— এদের সবার ক্রিয়াকলাপ। আর তার সঙ্গে এই অনবদ্য প্রকৃতি— একা একা আপনমনে শুধু চোখ ভরে দেখেই দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

তবে সবাই মিলে একসঙ্গে এরকম মিলেমিশে বেড়ানো এরকমটাও তো কোনওদিন হয়নি। এর মধ্যেও যে এত ভাললাগা আছে, ভালবাসা আছে তা তো কোনওদিন সুচিরার জানা ছিল না। হঠাৎ যেন একটা খোলা হাওয়া এসে নাড়িয়ে দিয়েছে সুচিরাকে। বেঁচে থাকতে হলে এই হাওয়াটা যে প্রতিদিনের শ্বাস-প্রশ্বাসে কত দরকার, সেটা সুচিরা বুঝতে পারছে।

ঘরের দুটো খাটের ডানদিকেরটা সুচিরা নিজে নিয়েছে। বাঁ দিকে ঋতময়। ঋতময়ের বালিশের পাশে চশমা, টর্চ, প্রিয় বই। শুয়ে শুয়ে পড়তে ভালবাসে ঋতময়। খাটের সামনে ঘরে পরবার চটি। হ্যাঙারে একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলিয়ে দিল। মনেই হবে না ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই। একবার অবশ্য মনে হয়েছে, ঘরে কেউ এলে কী ভাববে! তারপর মনে হল, ভাবার কী আছে? সে তার ঘর যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করবে। কে কী মনে করল— ভাবার দরকার কী? নিজের ইচ্ছেটাই এখানে বড় কথা।

প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে এক নিঃশ্বাসে সব দেখে নেওয়া নয়। বুড়িছোঁয়া দৌড় একদমই নয়। বেশ ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে ঘোরা। কেউ ঘুরতে না চাইলে ঘরেই থাকতে পারে। কিন্তু সুচিরার সেটা আর ইচ্ছে করছে না। এই ক'দিনে সবকিছুই কেমন যেন বদলে গেছে। অভ্যাসগুলোও দিব্যি কেমন অন্যভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। খারাপ লাগছে না এতটুকু। সুচিরা তো হাসতেই ভুলে গিয়েছিল। থেকে থেকে শুধু চোখে জল আসত। বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে থাকত। এখানে সমরেন্দ্র কাউকে গম্ভীর হয়ে থাকতেই দেয় না। নিজের কষ্টটাকে বড় করে না দেখে সবার আনন্দকে বড় করে দেখার এই শিক্ষা তো সুচিরার ছিল না।

সমরেন্দ্রর জীবনের ঘটনাটা জানার পর সুচিরা নতুন করে নিজেকে ভাবতে শিখেছে। কত মানুষের জীবনে কত বিশাল মাপের দুঃখ ঢাকা আছে, বাইরের লোক তা জানতে পারে না। নিজেকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তারা প্রতিদিনের জীবনযাপন করছে। অন্যের কষ্ট দূর করার জন্য সান্ত্বনা দিয়ে কষ্ট লাঘব করার জন্য সবার আগে এগিয়ে আসছে। এদের দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় আপনি মাথা নত হয়ে যায়। এরকম মানুষের সংস্রবে না এলে জীবনের যে একটা অর্থ আছে, সেটা সুচিরা কোনওদিন উপলব্ধি করত না।

ঋষিকোণ্ডার মেয়াদ এবার শেষ হওয়ার মুখে। আর দু'দিন বাকি। নয়ন ভরে এই দুটো দিন ঋষিকোণ্ডাকে দেখবে সুচিরা। পরদিন খুব ভোরবেলা, অন্ধকারটা পুরো কাটেনি, সুচিরা একটু ঠিকঠাক হয়ে বাইরে বেড়িয়ে এল। একান্ত অন্তরঙ্গ করে নিজের মনে দেখা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। হঠাৎ মনে হল, একটু দূরে একটা বড় পাথরের ওপর একজন কেউ বসে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটু আগিয়ে তাকিয়েই সুচিরার স্পষ্ট মনে হল, ঋতময় বসে আছে। পরনের প্যান্ট শার্টটা ভীষণ চেনা। বসার ভঙ্গিটা অবিকল একরকম। এ কী দেখছে সুচিরা! ঠান্ডায় যেন একটু কুঁকড়ে আছে। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেল সুচিরা। বদ্ধ ধারণা হল— ওই মানুষটা ঋতময় ছাড়া কেউ না। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে জহর কোটটা হাতে নিয়ে ছুটল। সিঁড়ির দু'ধাপ নামতেই পা স্লিপ করল। ঘোরের মধ্যেই কানে এল নীলেশের গলা— সমর শিগগির আয়। গড়িয়ে যেতে যেতে সুচিরা আটকে গেল সবল হাতের ঘেরাটোপে। ওরা দুজন ওকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। বুকের কাছে তখনও ধরা ঋতময়ের জহরকোট। সমস্ত শরীরটা ওর থরথর করছিল। শারীরিক-মানসিক দু'রকম উত্তেজনাই ছিল। কোথাও লেগেছে কিনা বারবার ওরা জিজ্ঞেস করছিল। সুচিরা কোনও কথাই বলতে পারছিল না। মাথাটা শুধু দু'দিকে নেড়ে যাচ্ছিল।

এরপর তো ম্যানেজারবাবু ডাক্তার নিয়ে আসা, প্রাথমিক যা কিছু করার সবই করলেন। চোট বেশি হতেই পারত যদি নীলেশের চোখে প্রথমেই সুচিরা ধরা না পড়ত। নীলেশও যে বারান্দার অন্যধারে দাঁড়িয়ে আছে এটা সুচিরা লক্ষই করেনি। সুচিরা আরও অবাক হল, যখন শুনল এ দুটো দিন আর কেউ কোথাও ঘুরতে যাবে না। সবাই ঘরে থাকবে সুচিরাকে নিয়ে। সত্যি এরা একটি যৌথ পরিবার। আজকের দিনে এই সহমর্মিতা কেউ আশাই করতে পারে না। অথচ কত সহজ মনে এরা এটি পালন করছে। নিজেদের মধ্যে গল্প-গান-হাসি-ঠাট্টায় এ দু'দিন কাটানো হবে। কৃতজ্ঞতায়-আবেগে-ভালবাসায় সুচিরা নতুন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করল। জীবনকে জীবনের সঙ্গে যোগ করতে হয়। তা না হলে মানুষের বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক।

ইতিমধ্যে তুবুই ফোনে সমস্ত ঘটনাই অবগত হয়েছে। নীলেশ আর সমরেন্দ্রের সঙ্গে ফোনে আলাপও করে নিয়েছে। সামনের মাসে এসেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বলেছে।

যে সুচিরা ঋষিকোণ্ডায় এসেছিল, ফেরার সময় আর সে সেই সুচিরা নেই। একলা চুপচাপ নিজের বার্থে বসে থাকা নেই। এ কামরা ও কামরা ঘুরে সবার খোঁজখবর করা, প্রয়োজনে এগিয়ে আসা— এ সবই তার নতুন সংযোজন। এবার থেকে সে এই পরিবারের সদস্য। কলকাতায় ফিরেও অটুট থাকবে যোগাযোগ, দেখা সাক্ষাৎ, হঠাৎ হঠাৎ এক দু'দিনের সফরে বেরিয়ে পড়া— এ সবেরই এখন সেও সঙ্গী। বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ল তার জীবনের পথ। আশ্চর্য এক ভাললাগায় আর ভালবাসায় ভরা মন নিয়ে ফিরে চলেছে সুচিরা।

বাড়ির কাছে গাড়ি দাঁড়াতেই শুভশ্রী আর ওর স্বামী গেটের কাছে চলে এল। ওপর থেকে পারুলও নেমে এসেছে। সবাই সুচিরাকে দেখে খুশি। শুভশ্রী বলল, কী সুন্দর ফ্রেশ হয়ে ফিরেছেন। আমাদের দক্ষিণ দেশের গুণ আছে। সত্যি গুণ তো আছেই। সুচিরা সেটা বারবারই বলল।

জিনিসপত্র পারুলের জিম্মায় দিয়ে সুচিরা সোজা চানঘরে ঢুকে গেল। বেরুনোর পর পারুল বলল, একেবারে খেয়ে নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে যান। একটু শুয়ে বিশ্রাম করুন। সুচিরাও সেটাই চাইছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর চোখজোড়া ঘুম নিয়ে সুচিরা শোওয়ার ঘরে এল। দুটো বিছানা টানটান করে পাতা। ঋতময়ের খাটটার দিকে তাকাতেই চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে ঋতময়ের খাটে শুয়ে বালিয়ে মুখটা গুঁজে দিল। কোথায় লুকিয়েছিল এত কান্না কে জানে। সুচিরার মন বলে উঠল, ঋতময় তুমি আমাকে নিতে এসেছিলে। আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। যাওয়া হল না। জীবন আমাকে মরণের হাত থেকে ফিরিয়ে নিল। এতদিন তুমি একলা আমার বুকে লুকিয়েছিলে। সেদিনের পর থেকে তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেছ। আমি তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। এ আর হারিয়ে যাবে না। তুমি নতুন করে ফিরে এলে কারুর মুখের কথায়— কারুর চোখের চাওয়ায়, কারুর হাতের নিপুণ সেবায়। মরণ থেকে তুমি নতুন করে জেগে উঠেছ। আর আমায় তোমাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াতে হবে না।

কাঁদতে কাঁদতেই সুচিরার চোখ বুজে এসেছিল। ফোন বেজে উঠল। রিং শুনেই ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল সুচিরা। দশটা বেজে গেছে। তুবাইয়ের ফোন। ⌘⌘

ছবি : দীপঙ্কর রায়

বিশেষ রচনা

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল

শিকুল ভট্টাচার্য

বাদল দিনের ফুল কদমের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ। এটি আমাদের দেশের অতি প্রাচীন ও পবিত্র বৃক্ষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যসাহিত্যে কদমের স্থান অতি উচ্চে। মহাকবি কালিদাস থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সবার কাব্যেই কদম অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে।

বর্ষায় ফোটে কদমের ফুল। তাই বর্ষার বর্ণনায় কদমের উল্লেখ থাকে। কবি কালিদাস রচিত 'মেঘদূতম' কাব্যগ্রন্থে বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে কদমের নাম। এই কাব্যে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত এক যক্ষের মেঘকে দূত করে তার কুশল বার্তা যক্ষপ্রিয়ার কাছে পাঠাবার বর্ণনা আছে। মধ্যভারতের উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী রামগিরি পর্বত থেকে মেঘ যাবে সুদূর হিমালয়ের অলকাপুরীতে। সেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মেঘ যেসব নদী, পর্বত, গাছপালা, ফুল ফলের দেখা পাবে, কবি তাঁর কাব্যে সবার পরিচয় দিয়েছেন। তাতে বারে বারে কদমের কথা আছে। মেঘ যেখান দিয়ে যাবে, সেখানে তার বর্ষণে কদম ফুল ফুটতে শুরু করবে। বর্ষা এলে কদম কি না ফুটে পারে!

'নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈরারির্ভূত।' দেখি নীপপুষ্প হরিৎকেশর অর্ধবিকশিত যার। ভরা-বাদর, মিলন-বিরহ-যমুনার তীর এ সবকিছুই কদম পুষ্প ও কদম বৃক্ষের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে কবির অতীন্দ্রিয় চিন্তায় কদম বৃক্ষ, কদম পুষ্প এক চিরন্তন প্রেমের অনুষঙ্গ রূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' কবে যে ফোটে আজকের মহানগরীর ব্যস্ত পথিক হয়তো তার খোঁজ রাখেন না। তবু কদম ফোটে। হঠাৎ কোনও একদিন বর্ষণসিক্ত ব্যাকুল বাদল সাঁঝে পথিক চিত্ত হরষিত হয় পথ প্রান্তের কদম গাছে অজস্র ধারে ফুটে ওঠা কদম ফুল দেখে।।

রবীন্দ্র কাব্যে কদম ফুলের উল্লেখ বারে বারে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যাকুল বরষার মন-কেমন করা দিনে কদমের ফুল রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসের স্মৃতি বয়ে আনতো, আর দুঃখ ঝরা বর্ষা রাতে দিত আনন্দ ও আশার স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে আমরা বারে বারেই কদমের উল্লেখ পেয়েছি—

'এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে।।'

কালিদাসের নায়িকারা সাজতেন কদমের ফুলে-মালায়।

'মেখলাতে দুলিয়ে দিতেন
নবনীপের মালা।'

তারা ঘর, আসবাবপত্রও সাজাতেন কদম ফুল দিয়ে

'কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।'

রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায়— হে নিরুপমা গানে তিনি লিখেছেন—

নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে।
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর গানে—
'সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে ওঠে।'

কদম একটি দীর্ঘ ছন্দ মনোরম বৃক্ষ। লম্বায় দশ থেকে কুড়ি মিটার বা আরও বেশি হয়। ঋজু মসৃণ কাণ্ড সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। অসংখ্য প্রসারিত শাখা প্রশাখা শীর্ষদেশে রচনা করে একটি বিশাল ছায়াঘন ছত্র। পাতাগুলি বেশ বড় আকারের সরল পত্র। সবৃন্তক পাতা পাঁচ থেকে দশ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাতার আকার ডিমের মতো। মসৃণ চিকন সবুজ পাতাগুলি দেখতে ভারি সুন্দর। পাতার উপরপৃষ্ঠ মসৃণ, নিচের পৃষ্ঠ হাল্কা সবুজ ও ঈষৎ রোমযুক্ত। পাতায় শিরাবিন্যাস সুস্পষ্ট। পাতার কিনারা নিটোল। ফুল ফোটে ঘন পাতার আড়ালে। আপাতদৃষ্টিতে ফুলটি একটি গোলাকার একক পুষ্প মনে হলেও, বস্তুত এটি একটি গোলাকার পুষ্পাধারে অসংখ্য ছোট ছোট ফুলের সমষ্টি। ফুলের ব্যাস চার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রথমে ফুলের কুঁড়ি হাল্কা সবুজ রঙের থাকে। পরে তা হলুদ হয়ে যায়। একসঙ্গে অজস্র হলুদ ফুলে গাছ ভরে যায়। আলো হয়ে ওঠে চতুর্দিক। কবির মনে হয় 'আগুনের পুলক ফুটেছে যেন সোনার কদম্বফুলের ছটায়'। এর আকুল করা মদির গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে চারিদিক। কদমের ফুল বৃন্তের সাহায্যে শাখার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে, প্রবল বর্ষণেও বৃন্তচ্যুত হয় না। তাই কবির কাছে কদমফুল দৃঢ় প্রত্যাশার প্রতীক। ফল অপ্রাকৃত। ফলে থাকে অসংখ্য পক্ষল বীজ। এই বীজ বাতাসে ভেসে ভেসে দূরে ছড়িয়ে পড়ে বনসৃজনে সাহায্য করে।

কদম একটি অতি উপকারী বৃক্ষ। এর পাতা, ফুল-ফল, বল্কল সবই মানুষের কাজে লাগে।

ছায়াতরু রূপে কদম অতি আদৃত। ঘন পাতায় ভরা গাছটি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া দেয় বলে ছায়াতরু রূপে গাছটি পথের ধারে লাগানো হয়। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব শহরেই পথের ধারে কদম গাছ আছে। গাছটি বড় আকারের এবং অসংখ্য বড় বড় পাতায় ভরা বলে পরিবেশ থেকে ধূলিকণা শোষণ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে। সুন্দর সুঠাম তনুদেহ ও ফুলের জন্য শোভাবর্ধক তরু রূপে বিভিন্ন বাগ-বাগিচায় গাছটির সমাদর রয়েছে। কদমের ফল ভক্ষ্য। এর পাতা অতি উত্তম পশুখাদ্য। কদমের কাঠ খুব নরম। এর কাঠ প্যাকিং বাক্স— বিশেষ করে চা প্যাকিং করার বাক্স তৈরির কাজে লাগে। এর কাঠ দিয়ে দেশলাই বাক্স ও দেশলাই কাঠি তৈরি হয়। জুতোর গোড়ালি ও কাগজ তৈরিতেও কদম কাঠ ব্যবহার করা হয়।

সেই স্মরণাতীত কাল থেকে কদম গাছ ভেষজ গুণের জন্য পরিচিত। পাতার কাথ দিয়ে কুলকুচি করলে গলার ব্যথা কমে। পেটের পীড়াতেও এর ব্যবহার আছে। এ গাছের ছাল জ্বরের প্রতিষেধক, বলবর্ধক ও কৃমি নাশক। আদিবাসী সমাজে জন্ম নিয়ন্ত্রণে এর ফুল ও ফলের ব্যবহার দেখা যায়।

অধুনা প্রাচীন এই গাছটি রূপচর্চার ক্ষেত্রেও সাড়া ফেলেছে। ত্বক ও চুলের নানা সমস্যায় কদমের পাতা ও ফুলের ব্যবহার হচ্ছে। শরীর তরতাজা রাখতে ও দুর্বলতা দূর করতে কদমের জুড়ি নেই। কদমের ছাল বেটে কাথ চুলে লাগালে খুশকি বিনাশ হয়। আবার উকুনও মরে। কদম ফুল সেদ্ধ করা জল মুখে মাখলে ব্রণ দূর হয়।

কদম গাছের চাষ বীজ থেকে হয়। দ্রুত বর্ধনশীল এই গাছ বিশেষ যত্ন ছাড়াই বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গে পথের ধারে এবং পার্কে এই সুন্দর গাছটির এখন খুব চাহিদা।

কদমের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যানথোসেফালাস ইন্ডিকাস(Anthocephalus Indicus)। গাছটি রুবিয়েসি পরিবারভুক্ত।

কদমের মৃদু মদির সুবাসে অতি ব্যস্ত পথিকেরও পদক্ষেপ অল্পক্ষণের জন্য শ্লথ হয়ে যায়। ⌘⌘

ধারাবাহিক উপন্যাস

।। উনিশ ।।

আগে যা ঘটেছে :

এবারে ঋজুদার গন্তব্য টুটিলাওয়ার টাঁড়। সেখানে তাঁরা ডাঙ্গু মিঞার অতিথি। তবে ঋজুদা ঠিক করলেন তাঁরা ইজাহারের কুন্দ্রুগুটুর কাছারিবাড়িতে চলে যাবেন। রাতে জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন একটি টেপরেকর্ডার। কুন্দ্রুগুটুর জঙ্গলের পথে কয়েকজনের সঙ্গে তাদের দেখা হল যারা ডাঙ্গু মিঞার কাছে যাচ্ছে রণপা-র জন্যে লম্বা লম্বা মোটা বাঁশ নিয়ে। ঋজুদা রুদ্র আর ভটকাইকে রাতে জঙ্গলে পাঠালেন ওদের কান্ড কারখানা দেখতে। সেখানে ঘটল এক কান্ড। ওরা সেখান থেকে একজনকে গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে এল। দেখা গেল সে তাদের পূর্ব পরিচিত পরম। পরমকে খাইয়ে দাইয়ে সে রাতটা রেখে পরদিন তাকে তার গ্রাম সিঁদুরে পাঠিয়ে দিলেন ঋজুদা। গভীর রাতে খবর আসে পরমকে কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। পরদিন সকালে ঋজুদা বাদে বাকি সকলে পরমের অন্ত্যেষ্টিতে সিঁদুর গ্রামে যায়।

টুটিলাওয়ার টাঁড়ে

বুদ্ধদেব গুহ

নদীটি সরু এবং ছোট বড় পাথরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। শুখার দিন গেছে এতদিন তাই নদীতে জল বিশেষ নেই। এ তো শহরের শ্মশানঘাট নয় যে, শুকনো কাঠের যোগান থাকবে। কাঠগুলোর মধ্যে বেশকিছু কাঁচা ছিল। কাঁচা কাঠের ধুঁয়ো উঠতে লাগল এবং বিশেষ গন্ধ। চিতা ভাল করে ধরে ওঠার পরই ভাল করে আগুন লাগল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবি? সিঁদুর গাঁয়ের লোকদের কারোকে সঙ্গে নিয়ে তোরা ওই নবাগন্তুক বাইরের লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নে। যদি নিঃসন্দেহ হোস যে তারা ডাঙ্গু মিঞা বা সিদ্ধু মিঞার লোক, মানে, যারা পরমকে জবাই করেছে, তাদের একটু কড়কে দিবি। তবে প্রাণে মারিস না।

—যারা জবাই করেছিল তাদের মধ্যে কারো কারোকে এ গ্রামের কেউ-না-কেউ অবশ্যই দেখে থাকবে। করম তো নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। কারণ, তারা তো বাড়ি থেকেই পরমকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

—তখন তো আর কেউ জানত না যে ওই লোক দুটো পরমকে জবাই করার জন্য এসেছিল, তাই মনে হয় না তেমন করে কেউ লক্ষ করেছিল।

— তাছাড়া, এই অচেনা লোকেরা যে ডাঙ্গু মিঞা বা সিদ্ধু মিঞার লোক তাই বা নিশ্চিত জানা যাবে কী করে।

— লোকগুলো তো পায়ে হেঁটে আসেনি টুটিলাওয়ার টাঁড় থেকে। তারা নিশ্চয়ই কোনও গাড়ি বা জিপে করেই এসেছে। সেই বাহন একটু দূরেই কোথাও পার্ক করিয়ে রেখেছে।

আমি বললাম, তোদের এখানে থাকার দরকার নেই। ওদের বাহনটিকে খুঁজে বার করে তোরা তারই কাছাকাছি লুকিয়ে থাক। ফেরার সময় তারা ওই বাহনে চড়ে ফিরে যাবার উপক্রম করবে তোরা তখনই তাদের কড়কে দিবি।

তারপরই বললাম, কিন্তু কড়কাবি কী করে?

—তা নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। জিনিসপত্র আমার পিঠে-বাঁধা রুকস্যাকেই আছে।

—তবে তো ঠিক আছে। তারা আবার তোদেরও জবা না করে দেয়। খুব সাবধান।

ভটকাই খুবই বেপরোয়া গলাতে বলল, অত সোজা নয়। চেষ্টা করেই দেখুক না।

আমি বললাম, হাতুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যা।

—ওই লোকগুলো এখন কোথায় আছে?হাতুয়াকে জিজ্ঞেস করল ভটকাই।

হাতুয়া বলল, ওই যে বড় অর্জুন গাছটার নিচে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদেরই গ্রামের কেউ চেনে না। এরা কেউই কোডারমা থেকেও আসেনি। কারণ কোডারমার লোকদের আমিও চিনি। খুব সম্ভবত ওই লোকগুলিই ডাঙ্গু মিঞা কী সিদ্ধু মিঞার লোক।

ভটকাই বলল, ওদের এখানে পাঠাল কেন হাজি মেহাল থেকে?

— কেন আবার। কারা কারা পরমকে জবাই করে মারার জন্যে ব্যথিত বা আলোড়িত তা জানার জন্যে। আমি বললাম।

আমি বললাম, ওরা কি ভেবেছিল আমরা গা-বাঁচাবার জন্যে আড়ালে থাকব।

—সবকিছুরই সীমা আছে একটা সেটা কি ওরা জানে না? ভটকাই বলল।

—হয়ত জানে না। নয়তো জেনেও আমাদের যে ওরা 'ডোন্ট কেয়ার' করে তা দেখাবার জন্যেই এসেছে ওরা।

আমি বললাম।

মৃতদেহ দাহ করায় সবাই এখন ব্যস্ত, চিতার কাঠ সরে যাচ্ছে আগুনের তোড়ে, সেই কাঠ আবার আগুনে গুঁজে দিতে হচ্ছে। মুখাগ্নি করেছিল করমের ছেলে— পরমের তো ছেলেপুলেই নেই। আগুনের তেজ ভালই আছে। এরকমভাবে জ্বলতে থাকলে আর তিরিশ পঁয়তিরিশ মিনিটের মধ্যে দাহ শেষ হয়ে যাবে।

ভটকাই হাতুয়ার কাছে গিয়ে ওর কানে ফিস ফিস করে কী বলল। তারপর আমাকে ডেকে নিল।

দাহ শেষ হবার আগেই আমরা লোকগুলোর পাশ দিয়ে গিয়ে ওদের দিকে না তাকিয়েই হাজারিবাগের দিকে কানহারি পাহাড়ের পায়ের কাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে পায়ে চলা পথটি গেছে সেই পথে হাঁটা দিলাম।

ওরা গাড়িতে এসে থাকলে ওদের গাড়ি হয় কোররার রাস্তাতে, নয় গয়া রোডে রেখে থাকবে। আমাদের গাড়ি আছে কোররার রাস্তার উপরে একটি শিমুল গাছের নিচে।

সামনে একটি মস্ত শালগাছ ছিল। সেই গাছের গোড়াতে সিঁদুর লেপা, হাঁড়িকুড়িও পড়ে আছে কিছু। এই গাছটিকে বোধহয় সিঁদুর গাঁয়ের মানুষেরা পুজো-টুজো করে। গাছটার ডালপালা অল্প উঁচু থেকেই ছড়িয়েছে দু-পাশে, মানে, আড়াল আছে, তাই হাতুয়াকে বললাম, ওই গাছটাতেই চড়ে চারদিক দেখতে ওদের গাড়ির খোঁজ পায় কি না!

হাতুয়া একটু পরে নেমে এসে বলল, একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কানহারির পাহারতলিতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

— ড্রাইভার নেই?

— না। দেখলাম না তো কারোকেই।

—তার মানে, ড্রাইভারও অন্যদের সঙ্গে গেছে পরমের অন্ত্যেষ্টি দেখতে।

ভটকাই বলল, হবে। তার মানে তৃতীয় লোকটিই ড্রাইভার।

তারপরই বলল, আমি তাহলে গিয়ে অকাজটা সেরে ফেলি।

—কী অকাজ করবি?

—জিপের চারটে চাকারই হাওয়া খুলে দেব। তারপরে ওদের কড়কাই আর না কড়কাই, টুটিলাওয়ার হাজি মেহালে হেঁটে যেতে বাছাদের হালুয়া টাইট হয়ে যাবে।

বললাম, এই বুদ্ধিটা ভালই করেছিস। তবে তাড়াতাড়ি কর। আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে দেখে ওদের সন্দেহ হতে পারে। এখুনি চলে এলে তুই একেবারে 'কট রেড-হ্যান্ডেড' হয়ে যাবি।

ভটকাই বলল, দ্যাখই না! যাব আর আসব।

—আর ড্রাইভার যদি গাড়িতেই থেকে থাকে? হয়ত পেছনের সিটে শুয়ে আছে— একে গাছের ছায়া তায় মৃদু-মন্দ হাওয়া।

— অত ভাবলে চলবে না কি? তুই আর হাতুয়া গাছতলাতে বসে হাওয়া খা, আমি এলাম বলে!

ভটকাইয়ের কথামতো আমি আর হাতুয়া ওই শাল গাছটার নিচেই বসে পড়লাম একটা বড় কালো রঙা পাথর দেখে।

দূরের গয়া রোড ধরে বাস ও ট্রাক যাচ্ছিল মাঝে মধ্যে। তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই পথেই কিছুদূর গেলে পথের বাঁদিকে দেখা যায় পদ্মা রাজার সাদা রঙা প্রাসাদ আর তারপরেই হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক।

এই পার্কের আরেক নাম 'রাজডেরোয়া' ন্যাশনাল পার্ক। 'রাজডেরোয়া' মানে, রাজার ডেরা। এখানে একটি প্রকাণ্ড 'টাইগার-ট্র্যাপ' আছে— দেখার মতো। রাজাদের আমলে বাঘের তো অভাব ছিল না— এই ট্র্যাপের মধ্যে বাঘ ধরতেন রাজারা। তারপর সার্কাস কোম্পানি বা ভারতের কোনও না কোনও চিড়িয়াখানাকে বিক্রি করে দিতেন।

তারপরে বললাম, একদিন তোকে আর রামপূজনকে নিয়ে আসতে হবে এই টাইগার-ট্র্যাপ দেখাতে। অন্য জানোয়ার বিশেষ নেই এই ন্যাশনাল পার্কে। বড় বাঘ তো বহুদিনই হল দেখা যায় না— লেপার্ড দেখা যায় কখনও কখনও। তাছাড়া কচ্চিৎ সম্বর ও কোটরা হরিণ। নীল গাই দেখা যায় নিয়মিত। ভাল্লুক, মানে স্লথ বেয়ার— কখনও সখনও। নেকড়েও দেখা যায় কখনও কখনও। জংলি কুকুরের দলও, যাদের স্থানীয় ভাষাতে বলে 'মুন্তি কোঁয়া'।

ভটকাই চলে যাওয়ার পরে আমার টেনশন হতে লাগল। জিপে শুধু ড্রাইভার না থেকে যদি একাধিক লোক থেকে থাকে— তখন ভটকাই নিজেই বিপদে পড়বে না তো? আমারও যাওয়া উচিত ছিল সঙ্গে। এসব মনে হতেই আমি হাতুয়াকে বললাম, তুমি তো গাছ থেকে দেখেইছ জিপটা কোথায় আছে। তুমি বরং দৌড়ে যাও সেদিকে। ওই বাবু তো হাঁটতে হাঁটতেই গেছেন। অতএব তাঁকে ধরে ফেলতে তোমার অসুবিধা হবে না।

তারপর বললাম, তোমার টাঙ্গিটা কোথায়?

—সে তো ঘরে আছে। এমনি তো আর সঙ্গে নিয়ে বেরোই না।

তারপর বলল, যখন কোনও জঙ্গলে ঠিকাদারের হয়ে 'কুপ-কাটতে' যাই অথবা অন্য দরকার থাকে, তখনই কেবল সঙ্গে নিই।

বিরক্ত হয়ে বললাম, বেশ করো।

—পরমের মৃতদেহ সৎকারে আমার টাঙ্গি নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই ভেবেই আমি টাঙ্গি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোইনি। কাঠ যা কাটার তা তো গ্রামের অন্য লোকেরাই কেটে নিয়ে গেছিল।

বললাম, ঠিক আছে। এখন আর কথা না বাড়িয়ে দৌড়ে যাও ওই বাবুর কাছে। তোমাকে ওঁর দরকার পড়তে পারে।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে ভটকাই একা যেখানে আমি বসেছিলাম, সেই গাছতলাতে ফিরে এল।

উদ্বিগ্ন হয়ে আমি শুধোলাম, কী হল?

—কী আবার হবে? কার্যসিদ্ধি করে এলাম।

— চারটে চাকার হাওয়াই খুলে দিয়েছিস?

— হ্যাঁ। নাতো কী? শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ঝাড়েবংশে শেষ করে দিতে হয়।

— ড্রাইভার ছিল না? অন্য কেউ তো ছিল?

— না, ড্রাইভার একাই ছিল।

— তারপর?

—জিপটা ডাঙ্গু মিঞার জিপ নয়। সিদ্ধু মিঞা হুঁশিয়ার তো কম নয়। পাছে লোক নাম্বার লিখে রাখে তাই হাজারিবাগ থেকে ভাড়াতে আনিয়েছে জিপ।

—তা তো হল, কিন্তু ড্রাইভার কী বলল?

তার কি বলার মতো অবস্থা ছিল। সকাল থেকে পেটে না পড়েছে দানাপানি, না পড়েছে এক ফোঁটা মহুয়া। এই জঙ্গলের ঘোঁৎঘাৎও তার জানা নেই। হাতুয়াকে দেখামাত্র সে তাকে গাইড করে নিয়ে চলল সেই ডেরাতে। চা-খাবার কিছুই পাবে না কিন্তু চাতক পাখির মতো সে যা খুঁজছে তা পাবে। তাই হাতুয়ার হাত ধরে সে চলে গেল সেই জাহান্নামই বল জাহান্নামই, আর বেহেস্তই বল বেহেস্তেই।

—ডেরা মানে?

—আরে ডেরা মানে ঠেক। কলকাতার আঁতেলদের যেমন খালাসিটোলা সেইরকমই এদের ডেরা। কোনও বড় গাছতলায়, বসন্তশেষের ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে। সেখানে বসে থাকলে এমনিতেই নেশা হয়ে যায় মহুয়া না খেয়েই। ⌘⌘ ক্রমশ

ছবি : দীপঙ্কর রায়

স্নান বিলাস

স্নান মানেই সারাদিনের ক্লান্তি, ধুলো- ময়লা এক নিমেষে ধুয়ে মুছে সাফ। শুধু গরমকালে নয়, সারা বছর দিনে দু'বার নিয়মিত স্নান করতে পারলে শরীর সুস্থও থাকবে। আর পাবেন তরতাজা অনুভূতি। প্রতিদিনের জল ঢেলে ঝপাঝপ স্নান ছাড়াও যারা একটু বিলাসী, তাদের জন্য রয়েছে আরামদায়ক নানা রকমের স্নান। তারই বর্ণনা এবারের রূপটানের পাতা জুড়ে।

অনেক যুগ আগের কথা। মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা নাকি স্নান করতেন দুধ, গোলাপ জল আরও অনেক কিছু দিয়ে। স্নানের জলে গোলাপ পাপড়ি ছড়ানো। স্নানের পাশাপাশি ত্বক, চুলের চর্চার জন্য হাজির থাকত নানা উপকরণ। ক্লিওপেট্রার স্নান মিথ হয়ে আছে স্নানবিলাসীদের কাছে। আর তাঁর স্নান বিলাসিতা নব্য রূপ ধরে হয়েছে 'স্পা'। যারা নতুন কিছু উপভোগ করতে সব সময় তৈরি, তাদের জন্য বিশদ বর্ণনা স্নান বিলাসের।

এনার্জি বাথ— সকালবেলা স্নানের জলে ১০ ফোঁটা অরেঞ্জ অয়েল মেশান। তার পর সেই জল দিয়ে স্নান সারুন। সারাদিন এনার্জিতে ভরপুর থাকবেন।

স্লিপিং বাথ— অনেকেই ঘুমের সমস্যায় ভোগেন। স্নান কিন্তু এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। রাতে শোয়ার আগে জলে ১০-১২ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল ফেলে স্নান করুন। এক ঘুমে রাত কাবার হবে। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে স্নানের বদলে এই জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ঘাড়, হাত-পা মুছে নিন। একই উপকার পাবেন।

পেইন বাথ— কোমর, ঘাড়, হাত সমেত জয়েন্ট পেইনে ভুগছেন? ব্যথা কমাতে প্রথমে ঈষদুষ্ণ জলে আর পরে ঠান্ডা জলে স্নান করুন। এই স্নানের জন্য বাথটাব থাকলে খুব ভাল হয়। না থাকলে শাওয়ারের জলেও স্নান সারতে পারেন। কারণ, শাওয়ারের জলের তীব্রতাওব্যথার পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। ব্যথার জায়গা যেমন হাত-পা-ঘাড় ইত্যাদি শাওয়ারের নীচে রাখুন। বেশ কিছুদিন নিয়মিত করতে পারলে ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন।

হার্বাল বাথ— ভেষজ উপাদানের সাহায্যে স্নান। একটি বালতিতে সম পরিমাণ দুধ আর জল মেশান। তাতে ২৫ গ্রাম মধু মিশিয়ে স্নান করুন। মাখন- মসৃণ ত্বক পাবেন। শরীরও তাজা থাকবে অনেকক্ষণ।

পারফিউম বা বিউটি বাথ— ঘামের গন্ধ দারুণ অস্বস্তির ব্যাপার। পারফিউম বা বডি স্প্রে সাময়িক তাতে আড়াল টানতে পারে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। এর জন্য জরুরি পারফিউম বা বিউটি বাথ। এক বালতি ঈষদুষ্ণ জলে ৫০০ গ্রাম বাথসল্ট মিশিয়ে সপ্তাহে একদিন স্নান করুন। বাথসল্ট দিয়ে স্টিম বাথ নিলেও ঘামের গন্ধ চলে যায়। কারণ, স্টিম নেওয়ায় রোমকূপের মুখ খুলে যায়। এর মধ্যে বাথ সল্ট প্রবেশ করে দুর্গন্ধ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া, স্নানের জলে যে কোনও এসেনসিয়াল অয়েল, গোলাপ বা জুঁই ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিন। ম্যাজিকের মতো গন্ধ গায়েব।

আয়ুর্বেদিক বাথ— ত্বক আর চুলের নানা সমস্যায় জেরবার যারা, তাদের জন্য এই বাথ ভীষণ ভালো। জবা, বেল, টগর, জুঁই, গোলাপের মতো পরিচিত পাঁচটি ফুল, আম, জাম, পেয়ারা ইত্যাদির পাঁচটি জানা ফলের পাতা, পাঁচ রকম ধাতু যেমন, সোনা, রুপো, লোহা, সীসা, তামা একসঙ্গে জলে ফেলে ২-৩ ঘণ্টা রোদে রাখুন। তারপর সেই জলে স্নান করুন। এই জলে স্নান করলে ছোট থেকে বড়, সবার ত্বক বা চুলের সমস্যা কমে যায়।

স্নানের আগের রূপটান

স্নান অসম্পূর্ণ থাকে রূপটান ছাড়া। তাই ঘরোয়া কিছু রূপটান দেওয়া হল। এতে ত্বকও ভাল থাকবে। আবার স্নানের মজাও মিলবে—

- ডাবের জলে মটর ডাল এক রাত ভিজিয়ে শুকিয়ে নিয়ে পেস্ট করুন। সেটা স্নানের সময় দুধের সর বা দইয়ের সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে লাগান। খুব ভাল স্ক্রাবিংয়ের কাজ করবে।
- আরও একটি ভাল স্ক্রাবার, পাউরুটি দুধে ভিজিয়ে স্নানের আগে গায়ে ঘষুন। ডেড সেল উঠে আসবে।
- জলে আয়রনের সমস্যা থাকলে আগের দিন রাতে স্নানের জলে অল্প কর্পূর মিশিয়ে রাখুন। আয়রন কেটে যাবে।
- গরমে আমের মাঠা, কালো আঙুর বা তরমুজের রস মাখলে রোদে পোড়া কালচে ভাব কমে।
- ত্বক শুষ্ক হলে সাবান মেখে স্নানের পর তেল মাখা উচিত। তারপর আবার জল ঢেলে স্নান করে নেবেন। এতে বাড়তি তেল ত্বকে বসতে পারবে না।
- অয়েলি স্কিনে সরাসরি তেল না মেখে জলে দু'চামচ তেল মিশিয়ে নিন। ⌘⌘

তথ্য সহায়তায়: কেয়া শেঠ
কেয়া শেঠ'স স্পা
১৬৭, যশোদা ভবন, গড়িয়াহাট
যোগাযোগ: ২৪৬০-৯৯৯১-৫
তথ্য সংগ্রহ: উপালি সাহা

শ্বাসকষ্টর সমস্যা এখনকার দিনে বেশ কমন। চারপাশে আমরা শুনেই থাকি কেউ না কেউ এই সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু এখনও অনেকের ধারণা, এই রোগে ইনহেলার ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু কেন হয় শ্বাসকষ্ট আর ইনহেলারের ভূমিকাই বা সেখানে কী, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডা. অশোক সেনগুপ্ত

শ্বাসকষ্ট

শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা রোগীর সংখ্যা আমাদের চারপাশে প্রায় প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই এই রোগে ভুগতে পারেন। শারীরিক সমস্যা ছাড়াও চারপাশে যে মাত্রায় দূষণ বাড়ছে, তাতে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই রোগে আরও বেশি করে অনেকে আক্রান্ত হবেন।

শ্বাসকষ্ট বলতে সাধারণভাবে বোঝায় শ্বাসগ্রহণের সমস্যা। অর্থাৎ, শ্বাস নেওয়ার সময় পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পাওয়া। শ্বাসনালি যদি কোনও কারণে সংকুচিত হয়ে যায়, সেখান থেকেই শুরু হয় শ্বাসকষ্টর সমস্যা।

কী কী কারণে শ্বাসকষ্ট হয়

- শ্বাসনালির ক্রনিক ইনফ্লেমেটারি স্টেট
- এছাড়া ফুসফুসের আটারিতে যদি ব্লাড ক্লট হয়ে যায় (পালমোনারি এমবোলিজম) তাহলে শ্বাসকষ্ট হয়
- ফুসফুসের অন্যান্য সমস্যা ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি, ক্রনিক লাংস প্রবলেম, নিউমোনিয়া, পালমোনারি হাইপারটেনশন থেকেও শ্বাসকষ্ট হয়
- নাক বা গলার এয়ার প্যাসেজে যদি কোনও ব্লক থাকে
- দীর্ঘদিন তামাকের ধোঁওয়া যদি শ্বাসনালি বা ট্র্যাকিয়াতে ঢোকে
- এছাড়াও পরিবেশগত দূষণ, ধুলো থেকে এই সমস্যা বাড়ে
- পারিবারিক ইতিহাস থাকলে
- শ্বাসকষ্ট ফুসফুসজনিত সমস্যা ছাড়াও হার্টের অসুখ থাকলেও হতে পারে। হার্ট যদি ঠিকমতো পাম্প করে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাঠাতে না পারে তখনও শ্বাসকষ্ট হয়
- এছাড়া শ্বাসকষ্টর আর একটা বড় কারণ অ্যালার্জি। অনেকসময় অ্যালার্জিতে প্রবল শ্বাসকষ্টের সঙ্গে গায়ে চাকা চাকা র‍্যাশও বেরোয়
- যদি ব্রেন বা শরীরের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্গ্যান প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পায় তাহলেও শ্বাসকষ্ট হয়। যেমন অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ব্রেনে অক্সিজেন ঘাটতির ফলে ঘুমের সময় শ্বাসকষ্ট হয়
- ক্রনিক সাইনোসাইটিস, অ্যাজমার সমস্যা থেকেও শ্বাসকষ্ট হয়। এসময় শ্বাসকষ্টর সঙ্গে নাকবন্ধ, চোখ দিয়ে জল পড়ার সমস্যা থাকে
- ফুসফুসের ক্যান্সার, টিউবারকিউলোসিসের মতো রোগেও উপসর্গ হিসেবে শ্বাসকষ্ট থাকে রোগীর
- আর আছে অ্যাংজাইটি। অ্যাংজাইটি বেশি থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়।
- হাইপোথাইরয়েডিজমের অন্যতম উপসর্গ শ্বাসকষ্ট।

শ্বাসকষ্ট প্রধানত দু'রকমের হয়, ফুসফুস সংক্রান্ত অ্যাজমা এবং সিওপিডি অর্থাৎ ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ। অ্যাজমার সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু সিওপিডি-র সঙ্গে ধূমপানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

নিম্নলিখিত কোনও উপসর্গ থাকলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে অবিলম্বে যাওয়া প্রয়োজন—

- একসঙ্গে দু'সপ্তাহের বেশি শ্বাসকষ্ট আছে
- তার সঙ্গে বুকে অস্বস্তি
- বুকে ব্যথা বা ভারী লাগা
- অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়া
- সিঁড়ি উঠতে শ্বাসকষ্ট
- বিশ্রামরত অবস্থাতেও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে
- গলায় মনে হয় কিছু আটকে রয়েছে

শ্বাসকষ্ট কেন হচ্ছে, তা জানার জন্য প্রথমেই চিকিৎসককে রোগীর

সম্পূর্ণ মেডিকেল হিস্ট্রি নিতে হবে। আগে তার কী কী রোগ হয়েছিল, তার কোনও অ্যালার্জি আছে কি না, কবে থেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, পরিবারে কারও শ্বাসকষ্টের ইতিহাস আছে কি না, রোগী ধূমপান এবং অ্যালকোহল সেবন করে কি না ইত্যাদি। এছাড়াও কয়েকটি বেসিক পরীক্ষা করতে হয়, যেমন, চেস্ট এক্স রে, পিএফটি বা পালমোনারি ফাংশান টেস্ট। চেস্ট এক্স রে তে ফুসফুস, বুকের হাড়ের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। সাইনাসের সমস্যা থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে সিটি স্ক্যান করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট

কারওর যদি বিশেষ কোনও খাবার বা ওষুধের গ্রুপে বা অন্য কিছুতে (যেমন- ফুলের রেণু, ডাস্ট মাইটস, আরশোলা, সুগন্ধী) অ্যালার্জি থাকে, এবং সেখান থেকেই শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে তার চিকিৎসায় অ্যালার্জি টেস্ট নিঃসন্দেহে জরুরি। এক্ষেত্রে প্রথমে প্রিক টেকনিক ফলো করা হয়। প্রিক টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ হলে স্ক্র্যাচ টেস্ট, রাস্ট (রেডিয়ো অ্যালার্গো সোরবেন্ট টেস্ট) নামক বিশেষ ধরনের ব্লাড টেস্ট ও চ্যালেঞ্জ টেস্ট করানো হয়।

অপারেশন ও শ্বাসকষ্ট

যে কোনও অপারেশনের পর রোগীর শ্বাসকষ্টর সমস্যা হতে পারে। যেমন অ্যাপেন্ডিক্স বা গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের পর রোগীর পেটে চাপ লাগবে বলে ঠিকমতো কাশতে পারে না, কাশি আটকে রাখে। এখান থেকেই শ্বাসকষ্টর সমস্যা ত্বরান্বিত হয়।

প্রেগনেন্সি ও শ্বাসকষ্ট

অনেক মহিলারই প্রেগনেন্সির সময় শ্বাসকষ্ট হয়। অনেকের কথা বলতে বলতে বা রাত্রে শুয়ে শ্বাসকষ্টর সমস্যা হয়। তার দুটি কারণ থাকে— ১) গর্ভস্থ ভ্রূণ ডায়াফ্রামের উপর চাপ দিতে থাকে, এর ফলে মাসল লেয়ারগুলো ইন্টেস্টাইন থেকে লাংসকে আলাদা করতে চায়, ২) শরীরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বাচ্চা জন্মানোর পর শ্বাসকষ্ট কমে যায়। কিন্তু যদি অ্যাজমা বা নিউমোনিয়ার মতো রোগ থাকে, তবে ফেলে রাখবেন না। আর বিশেষ করে মনে রাখবেন, এসময় অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ বা ইনহেলার ব্যবহার করবেন না।

ইনজুরি ও শ্বাসকষ্ট

কোনও আঘাত বা অ্যাক্সিডেন্ট থেকেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। যেমন ধরুন পথ দুর্ঘটনায় কারও বুকের পাঁজর যদি ভেঙে যায়, রক্তপাত হয়, তাহলে ফুসফুস চুপসে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়। আবার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি থেকেও শ্বাসকষ্ট হয়। ব্রেনের একটি বিশেষ অংশ মেডুল্লাতে আঘাত লাগলেও শ্বাসের সমস্যা হয়। একে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে অ্যাপিনা। রেসপিটারি ইনসাফিসিয়েন্সি দেখা যায়। অর্থাৎ ফুসফুস পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না এবং কোষের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনের থেকে বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ফলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়।

ব্রেন স্টেম বিশেষ করে মেডুল্লাতে ট্রমা হলে রেসপিরেটারি অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অ্যারেস্ট মাইল্ড থেকে সিভিয়র বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। পাঁচ মিনিটের বেশি এই অ্যারেস্ট হলে, ভাইটাল অর্গ্যান ফেলিওর তো বটেই, প্রাণসংশয় পর্যন্ত হতে পারে।

রাত্রে যদি শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে সেটা হার্ট বা ফুসফুসের কোনও সমস্যা হতে পারে। রাত্রে আমাদের শরীরের স্টেরয়েড লেভেল অনেকটাই কমে যায়, যা শ্বাসকষ্টের অন্যতম কারণ। সুতরাং রাত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে এক মুহূর্ত ফেলে না রেখে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

শ্বাসকষ্টর চিকিৎসা

শ্বাসকষ্টর চিকিৎসা পুরোটাই নির্ভর করে কেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার উপর। অ্যাজমা , ফুসফুসের রোগ বা হার্টের রোগ যে কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তাকে আগে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর রোগের উৎসের চিকিৎসা। আবার প্রেগনেন্সিতে শ্বাসকষ্ট হলে অনেকেরই আবার ডেলিভারির পর কমে যায়।

শ্বাসকষ্টে সাধারণত দু'ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়— ব্রঙ্কো ডাইলেটার এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি ইনক্লুডিং কর্টিকো স্টেরয়েড। অ্যাজমা কমাতে ওরাল ওষুধের রোল খুব একটা কার্যকরী নয়। কারণ এতে শরীরে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ ঢোকে এবং তার নানারকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এক্ষেত্রে ইনহেলার ব্যবহার করা খুবই সেফ। কারণ ইনহেলার সরাসরি ফুসফুসে চলে গিয়ে কাজ করে। সব রোগীকেই ইনহেলার দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় কম্বিনেশন ইনহেলার। ইনহেলার সরাসরি শ্বাসনালির ইনফ্লেমেশান কমিয়ে শ্বাসগ্রহণের প্যাসেজটাকে ক্লিয়ার করে দেয়। গর্ভবতী মহিলারাও ইনহেলার ব্যবহার করতে পারেন। অন্য কোনও শারীরিক অসুবিধা, যেমন প্যানক্রিয়াটাইটিস বা সিরোসিস অব লিভারে আক্রান্তদের ক্ষেত্রেও ইনহেলার ব্যবহারে কোনও বাধা নেই। তবে ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে অবশ্যই। আবার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে শ্বাসকষ্ট হলে ব্রেন যাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শ্বাসকষ্টর কারণ যদি হাইপোথাইরয়েড হয় তার চিকিৎসা আবার অন্য।

এছাড়াও অ্যালার্জির ক্ষেত্রে অ্যান্টি হিস্টামাইন, ডি কনজেসটান্টস জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

সতর্কতা

- আপনার শরীরের বডি মাস ইনডেক্স অনুযায়ী সঠিক ওজন বজায় রাখুন। যদি আগে থেকে ফুসফুসের সমস্যার কোনও ইতিহাস থাকে, তাহলে তো আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত
- নিয়মিত ব্যবধানে ওজন চেক করান
- অ্যালকোহল ও ধূমপান বন্ধ করতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল খেলে ফুসফুসের কার্যকারিতা অনেকাংশে নষ্ট হয়
- ধোঁয়া বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন থেকে দূরে থাকুন।
- নিয়মিতভাবে হেলথ চেক আপ করান
- অতিরিক্ত স্ট্রেস কমান
- শ্বাসকষ্ট ছাড়া শরীরে অন্য কোনও রোগ না থাকলে নিয়মিত এক্সারসাইজ করা যেতে পারে ফিটনেস এক্সপার্টের পরামর্শে। ⌘⌘

সাক্ষাৎকার : দোয়েল দত্ত

রেলসূচি

পূর্ব রেলের সময়সূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২২৭৩	দুরন্ত এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.০০	(সোম, শুক্র)
১২৩১১	দিল্লি-কালকা মেল	১৯.৪০	
১৩০০৫	অমৃতসর মেল	১৯.১০	
১২৩২১	মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২২.০০	
১২৩৮১	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	৮.২০	(ভায়া গয়া, বেনারস)
১২৩০৩	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি) (ভায়া পাটনা)	৮.১০	
১২৩২৩	হাওড়া-নিউদিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৮.৪৫	
১২২৪৯	যুব এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	১৭.১০	(বৃহ)
১২৩০১	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১৬.৫৫	(রবি ছাড়া)
১২৩০৫	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১৪.০৫	(রবি)
১২৩০৭	যোধপুর এক্সপ্রেস	২৩.৩০	
১২০১৯	শতাব্দী এক্সপ্রেস (বোকারো, রাঁচী)	৬.০৫	(রবি ছাড়া)
১৩৪৮৫	মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৫.১৫	(রবি ছাড়া)
১২৩৩১	হিমগিরি এক্সপ্রেস (জম্মু-তাওয়াই)	২৩.৫৫	(মঙ্গল, শুক্র, শনি)
১২৩৬৯	কুম্ভ এক্সপ্রেস (হরিদ্বার)	১৩.১০	(সোম, বুধ, বৃহ, শনি, রবি)
১২৩৪৫	সরাইঘাট এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি)	১৫.৫০	
১২৩২৭	উপাসনা এক্সপ্রেস (দেরাদুন)	১৩.১০	(মঙ্গল, শুক্র)
১৩০৩৯	দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস	২০.২০	
১৩০৪৯	অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৪.০০	
১৮০১৯	বাঘ এক্সপ্রেস (কাঠগুদাম)	২৩.৪৫	
১৩৮২১	মিথিলা এক্সপ্রেস (রক্সৌল)	১৫.৪৫	
১২৩৮৫	ডবলডেকার এক্সপ্রেস (ধানবাদ)	৮.৩০	
১২৩৪১	অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস (আসানসোল)	১৮.২০	
১২৩৫১	দানাপুর এক্সপ্রেস	২০.৩৫	
১২৩৩৭	শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১০.১০	
১৩০১৫	কবিগুরু এক্সপ্রেস (বোলপুর)	১০.৪৫	
১৮০১৭	গণদেবতা এক্সপ্রেস	৬.০৫	
১২৩৩৩	বিভূতি এক্সপ্রেস (বেনারস)	২০.০০	
১৩০২৭	কবিগুরু এক্সপ্রেস (আজিমগঞ্জ)	২২.৪০	
১২১৭৫	চম্বল এক্সপ্রেস (গোয়ালিয়র)	১৭.৪৫	(মঙ্গল, বুধ, রবি)
১৯৩০৬	শিপ্রা এক্সপ্রেস (ইন্দোর)	১৭.৪৫	(সোম, বৃহ, শনি)
১১৪৪৮	শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (জব্বলপুর)	১৪.৩০	
১২১৭৭	চম্বল এক্সপ্রেস (আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট)	১৭.৪৫	(শুক্র)
১৩০৫৩	হাওড়া-সিউড়ি এক্সপ্রেস	২০.৩৫	

পূর্ব রেলের সময়সূচি (শিয়ালদহ থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৩১৩	রাজধানী এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১০২৫৯	নিউদিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৮.৪০	(সোম, বুধ, বৃহ, রবি)
১২৩৭৭	পদাতিক এক্সপ্রেস (নিউ জলপাইগুড়ি)	২২.৫৫	
১৩১৪১	তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩.৪০	
১২৩৪৩	দার্জিলিং মেল	২২.০৫	
১৫৬৫৭	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	৬.৩৫	
১২৩৭৯	জালিনওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.১০	(শুক্রবার)
১৩১৪৭	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (নিউ কোচবিহার)	১৯.৩৫	
১৩১৪৯	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (আলিপুরদুয়ার)	২০.৩০	
১৩১৬৩	হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (সহর্ষ)	২০.১০	
১৩১৩৩	শিয়ালদহ- বেনারস এক্সপ্রেস (এসবিজি লুপ)	২১.১৫	
১২৩১৭	অকালতখ্ত এক্সপ্রেস	৭.৪০	(বুধ, রবি)
১৩১৫৩	গৌড় এক্সপ্রেস	২২.১৫	

পূর্ব রেলের সময়সূচি (কলকাতা (চিৎপুর) থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১৩১১১	লালকেল্লা এক্সপ্রেস (ভায়া মেন লাইন)	২০.১৫	
১৫০৪৯	গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(বুধ, রবি)
১৫০৫১	গোরক্ষপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (ভায় নারকাটিয়াগঞ্জ)	১৪.৩০	(শুক্র)
১৫০৪৭	পূর্বাঞ্চল (গোরক্ষপুর) এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(সোম, মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১৫১	জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১৩১৫৫	মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (দ্বারভাঙা)	২০.৫৫	(বৃহ, রবি)
১২৩৫৯	গরিব রথ এক্সপ্রেস (পাটনা)	২০.০০	(মঙ্গল, বৃহ)
১২৩৬৩	হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৯.০৫	(মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১১৩	হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস (মুর্শিদাবাদ লালগোলা)	৬.৫০	
১৯৬০৫	সারে জাঁহা সে আচ্ছা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (আজমীর)	১৩.১০	(শনি)
১২৩১৯	আগ্রা এক্সপ্রেস	১৩.১০	(বুধ)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সময়সূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৮৩৯	চেন্নাই মেল	২৩.৪৫	
১২৮১০	মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	২০.১৫	
১২৮৬০	গীতাঞ্জলি মুম্বই এক্সপ্রেস	১৩.৫০	
১২৮৩৪	আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস	২৩.৫৫	
১২৮৪১	করমণ্ডল (চেন্নাই এক্সপ্রেস)	১৪.৫০	
১২৭০৩	ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	৭.২৫	
১২৮১৩	টাটা স্টীল এক্সপ্রেস	১৭.৩০	
১২৮৭১	ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	৬.৫৫	
১২৮৩৭	পুরী এক্সপ্রেস	২২.৩৫	
১৮৪০৯	শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৯.০০	
১২৮২১	ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	৬.০০	
১২৮৪৭	হাওড়া-দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১১.১৫	
১৮০০১	হাওড়া-দীঘা কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৪.১৫	
১৮৬৪৫	ইস্ট কোস্ট (হায়দরাবাদ) এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১২৮২৭	পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১২১৩০	আজাদ হিন্দ (পুনে) এক্সপ্রেস	২১.৫৫	
১২৮৮৩	রূপসী বাংলা (পুরুলিয়া এক্সপ্রেস)	৬.০০	
১২২৭৭	হাওড়া-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৪.২৫	বুধবার ছাড়া
১২২৬২	হাওড়া-মুম্বই (ভি টি) দুরন্ত এক্সপ্রেস	৮.২০	সোম, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র
১২৮৭০	হাওড়া-মুম্বই উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	শুক্রবার
১২২৪৫	হাওড়া-যশবন্তপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১১.০০	মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও রবি
১২০৭৩	ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস	১৩.৩৫	রবিবার ছাড়া
১২১০২	জ্ঞানেশ্বরী (কুরলা, মুম্বই) এক্সপ্রেস	২২.৫৫	সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও রবি
১৮৬১৭	হাওড়া-রাঁচী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ভায়া টাটানগর	১৫.০৫	বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
১৫৯০২	ডিব্রুগড়-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১.০৫	রবিবার
১৫৬১২	কামাক্ষ্যা-হাওড়া-কুরলা কর্মভূমি উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	রবিবার
১২৮৯৫	হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস	২০.৫৫	শুক্রবার
১৮০৪৭	হাওড়া- ভাস্কো অমরাবতী এক্সপ্রেস	২৩.৩০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি
১২৮৬৫	হাওড়া-পুরুলিয়া লালমাটি এক্সপ্রেস	৮.৩০	মঙ্গল ও শনি
১২৫১৫	ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	১১.১৫	মঙ্গলবার
১২৬৬৩	তিরুচিরাপল্লী বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	বৃহস্পতিবার
১২৬৬৫	কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস	১৬.১০	সোমবার
১২৯০৬	হাওড়া-পোরবন্দর/ওখা এক্সপ্রেস	২২.৫৫	শুক্র, শনি
১২৫১৩	সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া-গুয়াহাটি উইকলি এক্সপ্রেস	১১.১৫	সোমবার
১৫২২৮	মুজফ্ফরপুর-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.১৫	সোমবার
১৫২২৭	যশবন্তপুর-হাওড়া-মুজফ্ফরপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.১৫	শুক্রবার
১২১৫২	হাওড়া-কুরলা সমরাষ্ট্র এক্সপ্রেস ভায়া আদরা	২১.১৫	শুক্রবার
১৫৭২২	নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-দীঘা ফারিয়া এক্সপ্রেস	৭.৫০	শনিবার
১২৮৬৭	হাওড়া-পণ্ডিচেরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.৩০	রবিবার
১২৫৭১	হাওড়া-শ্রী সত্য সাঁই প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১৫.৫০	বুধবার
২২৮১৭	মাইসোর উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	শুক্রবার
১৫৬৪৪	কামাক্ষ্যা-হাওড়া-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.৩০	শুক্রবার

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সময়সূচি (শালিমার থেকে)

১৮০৩০	কুরলা এক্সপ্রেস	১৫.০০	
১৬৩২৪	শালিমার-ত্রিবান্দ্রম বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	২২.৪৫	মঙ্গল ও রবিবার
১৫০২১	শালিমার-গোরক্ষপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২০.২৫	মঙ্গলবার
১৮০০৭	শালিমার-বারিপদা ইন্টারসিটি ট্রাই-উইকলি এক্সপ্রেস	৬.৪০	রবি, বুধ ও বৃহস্পতি
২২৮৩৫	শালিমার-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২১.০০	বুধবার
২২৮৫৩	শালিমার-বিশাখাপত্তনম উইকলি এক্সপ্রেস	১৮.১৫	মঙ্গলবার
২২২১৩	শালিমার-পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২.০৫	সোম, বুধ ও শুক্র
২২৮৫৯	শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ উইকলি এক্সপ্রেস	১২.২০	শুক্রবার

দক্ষিণ পূর্ব রেলের সময়সূচি (শালিমার থেকে)

২২৮৫৫	সাঁতরাগাছি-তিরুপতি উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৬.০৫	
১২৭৬৮	সাঁতরাগাছি-হাজুর সাহিব নানদেদ উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৫০	বুধবার

রেল সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২৬৩৮ ২২১৭/২৬৩৭ ৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৮৪, পূর্ব রেলওয়ে ১৩১০, শিয়ালদহ অনুসন্ধান ২৩৫০ ৩৫৩৫/৩৫৩৭, হাওড়া অনুসন্ধান ২৬৩৮ ২৫৮১ শালিমার ২৬৬৮ ১১২১, হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্স ১৩৩১/১৩৩২, হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স ২৬৩৮ ২২১৭, রিজার্ভেশন এনকোয়্যারি ১৩৯

উড়ানসূচি

এ.আই - এয়ার ইন্ডিয়া, বি.এ - ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, বি.জি - বিমান বাংলাদেশ, সি.ডি - অ্যালায়েন্স এয়ার, এফ.এস - কসমিক এয়ার, এফ.ডি - থাই এয়ার এশিয়া, জি.এফ - গাল্ফ এয়ার, আই.এক্স - এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, কে.বি - ড্রুক এয়ার, ই.কে - এমিরেটস, এস.জি - স্পাইস জেট, এস.কিউ - সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, এস.টু - জেটলাইট, টি.জি - থাই এয়ারওয়েজ, ৯ ডব্লিউ - জেট এয়ারওয়েজ, জেড ফাইভ - জি.এম.জি এয়ারলাইন্স, সিল্ক.ই - ইন্ডিগো, এ. কে - এয়ার এশিয়া, ফোর এইচ - ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ।

অভ্যন্তরীণ উড়ান

ফ্লাইট নং	কলকাতা থেকে ছাড়ার সময়	দিন
আগরতলা		
এস টু ৩৭১	৭.৫০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ২৭৩	৮.৫০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৩	১১.৩০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ২৪২	১২.১০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭১	১৪.১৫	প্রতিদিন
এ আই ৯৭২৭	১৬.৫০	বুধ, শুক্র, রবি
আহমেদাবাদ		
সিল্ক ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন (সোম-শনি)
সিল্ক ই ২৩৮	৮.১৫	রবিবার
সিল্ক ই ১৩৬	১১.১৫	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
আইজল		
৯ ডব্লিউ ২৮৭১	১০.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭১১	১১.০০	বুধ, শুক্র, রবি
ব্যাগডোগরা		
৯ ডব্লিউ ২৪৮০	১২.২০	প্রতিদিন
এ আই ০৭২১	১৩.০৫	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
এ আই ০৭২১	১৩.৪০	বুধবার
এস জি ৩২৩	১৩.৫৫	প্রতিদিন
বেঙ্গালুরু		
সিল্ক ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৫২৩	৭.২০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন
সিল্ক ই ৩৪২	২০.১০	প্রতিদিন
ভোপাল		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
ভুবনেশ্বর		
৯ ডব্লিউ ২১৫০	১১.২৫	প্রতিদিন
চেন্নাই		
সিল্ক ই ২৭৫	৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ৮৪২	১৫.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৩২৪	১৭.০৫	প্রতিদিন
সিল্ক ই ২৯১	২০.৩০	প্রতিদিন
দিল্লি		
এ আই ০১১১	১০.১০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ২৩৬	১১.৪৫	প্রতিদিন
এস জি ৬০৬	১২.০০	প্রতিদিন
এ আই ০৭৬১	১৩.২৫	প্রতিদিন
এস টু ৩২০	১৫.৩০	প্রতিদিন
এ আই ০৭০১	১৭.০০	প্রতিদিন
ডিব্রুগড়		
সিল্ক ই ২০৫	১২.৩০	প্রতিদিন
গয়া		
এ আই ০২২৭	১০.০০	সোমবার
গোয়া		
এস জি ৮০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
গুয়াহাটি		
এস টু ৩৬১	৬.১০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ২৯২	১৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৪৮২	১৬.৫০	রবিবার ছাড়া রোজ
এস জি ৮৮৩	১৭.৪৫	প্রতিদিন
হায়দরাবাদ		
সিল্ক ই ৩৪৮	৭.২৫	প্রতিদিন
সিল্ক ই ৩৫২	১৬.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭২	১৭.৫০	প্রতিদিন
ইন্দোর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
জয়পুর		
সিল্ক ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন
এস জি ৩৪৫	১৬.৪৫	প্রতিদিন
জোরহাট		
এস টু ৬২৩	১২.২৫	সোম, বুধ, শুক্র
কানপুর		
এ আই ৯৮০২	১৪.০০	সোম, বুধ, শুক্র
কোচি		
এস জি ৮০৩/১০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
সিল্ক ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন
লখনউ		
সিল্ক ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
মুম্বই		
সিল্ক ই ৩১৮	৫.৫৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২০৩	১৪.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০৪	১৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৪	১৮.০০	প্রতিদিন
সিল্ক ই ৪০৪ (ভায়া নাগপুর)	১৮.২০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২১২	২১.০৫	প্রতিদিন
নাগপুর		
সিল্ক ই ৪০৪	১৮.২০	প্রতিদিন
পাটনা		
৯ ডব্লিউ ২৮৫২	৬.১৫	প্রতিদিন
সিল্ক ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৮৫৪	১৭.৫০	প্রতিদিন
পোর্ট ব্লেয়ার		
এ আই ০৭৮৭	৫.৩৫	প্রতিদিন
পুণে		
৯ ডব্লিউ ২০২	৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ২১৯	১৭.৪০	প্রতিদিন
রায়পুর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
রাঁচি		
৯ ডব্লিউ ২৮৫৬	১৫.০৫	প্রতিদিন
শিলচর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
৯ ডব্লিউ ২৮৭৫	৫.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭৫৩	১৩.০৫	সোম, বুধ
শিলং		
এ আই ৯৭১৯	১১.৪০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি
এ আই ৯৭১১	১৩.১০	বুধ, রবিবার
শ্রীনগর		
এস জি ৬০৪/২২৪	৭.১৫	প্রতিদিন
তেজপুর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
ত্রিবান্দ্রম		
সিল্ক ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
বরোদা		
সিল্ক ই ২১২	৭.০৫	প্রতিদিন
বারাণসী		
৯ ডব্লিউ ২৪৬১	১১.০৫	প্রতিদিন
বিশাখাপত্তনম		
৯ ডব্লিউ ২৮৪১	৬.০৫	প্রতিদিন

বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য

এয়ার ইন্ডিয়া : ২২৮২ ২৩৫৬, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৯৪৩৩, জেট এয়ারওয়েজ : ৩৯৮৯ ৩৩৩৩, স্পাইস জেট : ১৮০০ ১৮০ ৩৩৩৩, ইন্ডিগো : ৪০০৩ ৬২০৪ এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৮৪৪২/৮৩৫৭, জেট লাইট : ১৮০০ ২২৩০২০, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ০৯০১

(রেল ও বিমানের ছাড়ার সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ। যাত্রার আগে অবশ্যই অনুসন্ধান করে নেবেন।)

বাসযাত্রা

রয়্যাল ক্রুজার

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-পুরী
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা
পুরী থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬টা ৪৫, সাড়ে সাতটা, সাড়ে নটা, বিকেল ৪টে ও বিকেল ৫টা
ধর্মতলা থেকে বিকেল ৪টেয় যে বাসটি ছাড়ে সেটি বোকারোও যায়।

এসবিএসটিসি

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা, ৬টা, ১০-১০, ১২-৪৫

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪০, ৬-৪০, ৭-৩০

কলকাতা-রায়গঞ্জ
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-১০, ৮-১০

কলকাতা-গঙ্গারামপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৩০, ৬-৫০, ৭-৫০

কলকাতা-নালাগোলা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬-১৫

কলকাতা-দুর্গাপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা থেকে সন্ধে ৬-৩০ (১৫ মিনিট অন্তর গাড়ি)

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে সকাল ৫-১৫ থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ৩-৩০, ৩-৪৫

কলকাতা-পুরুলিয়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ২-১৫

এনবিএসটিসি

কলকাতা-আলিপুরদুয়ার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-বহরমপুর
সকাল ৬-৪৫, দুপুর ১২টা। বহরমপুর থেকে ছাড়ে একই সময়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ১০টা, দুপুর ২-৪০। ওখান থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-৩০

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট রাত ৮টা

কলকাতা-চাঁচোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট ৯-৩০

কলকাতা-কোচবিহার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে দুপুর ২টো, রাত ৮টা, রকেট রাত ৮টা
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০, রকেট ৮টা

কলকাতা-দার্জিলিং
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-দীঘা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রকেট, রাত ৯-৩০

কলকাতা-জলপাইগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৮টা

জয় দাদা ভলভো

কলকাতা-তারাপীঠ
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সকাল ৭-১৫
তারাপীঠ থেকে ছাড়ে বিকেল ৪টে

কলকাতা-শিলিগুড়ি
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭-৩০

কলকাতা-আসানসোল
সল্টলেক থেকে সকাল ৯টা, বাবুঘাট থেকে ১০টা

কলকাতা-বোকারো
সল্টলেক থেকে সকাল ৬-৩০, বিকেল ৪টে বাবুঘাট থেকে সকাল ৭-৩০, বিকেল ৫টা

ভূরিভোজ

নিত্য নতুন চাইনিজ

গত কয়েক বছর ধরে এ শহরের ভাল চিনে খাবারের চেন হিসেবে মেনল্যান্ড চায়না তার জায়গা করে নিয়েছে। যারা সত্যিকারের চিনে খাবারের ভক্ত, যারা আপাদমস্তক মাছে-ভাতে হয়েও মাঝে মাঝে স্বাদ বদলানোর জন্য অথেনটিক চিনে খাবার খোঁজেন— তাদের জন্য মেনল্যান্ড চায়না এখন একটি অব্যর্থ চাইনিজ চেন।

বিশেষত এই বর্ষায় ইলিশ বাঙালির পাত থেকে উধাও হয়ে গেছে। প্রায় মরীচিকার মতোই ইলিশকে এখন শুধু পত্র-পত্রিকাতেই দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। বাঙালির সেই দুঃখের অবসান ঘটাতেই মেনল্যান্ড চায়না এবারের বর্ষায় নিয়ে এসেছে নানা ধরনের সুস্বাদু পদ। দেখতেও যেমন বাহারি, খেতেও লা-জবাব। যেমন— চাইনিজ ডিমসুম। যে বলবেন ডিমসুম বাঙালি তেলেভাজার চিনে সংস্করণ তিনি আর যাই হোক খাদ্যরসিক নন। যেরকম অনেকেই নিউট্রিলার মধ্যে মাংসের আস্বাদ পান। তারও খাদ্যপ্রীতি সম্পর্কে সন্দেহ হয়। মেনল্যান্ড চায়নার প্রধান শেফ রাজেশ দুবে জানালেন, এবারের বর্ষায় বাঙালির রসনাকে আরও একটু উসকে দেওয়ার জন্য ভেজ এবং ননভেজ ডিমসুমের একটি অ্যাসোর্টেড প্ল্যাটার তৈরি করা হয়েছে। এই প্ল্যাটারে ন'ধরনের ডিমসুম। এবং বলাবাহুল্য এক একটি ডিমসুম এক একটি স্বাদ গন্ধ বর্ণ নিয়ে হাজির। এছাড়াও স্টার্টার হিসেবে পাওয়া যাবে প্যান ফ্রায়েড স্পিনাচ ও পাকচয় ডাম্পলিঙ। বেকড ভেজিটেবল পাফ্— একবার চেখেই দেখুন। চাখার আগেই মনে হবে মুখের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল। না কি ট্রাই করবেন প্যান গ্রিলড্ ক্র্যাব কেক। কাঁকড়ার নরম তুলতুলে শাঁস দিয়ে মশলাদার কেক— এর পরেও যদি জিভের জলকে আপনি বশে রাখতে পারেন তাহলে সত্যিই আপনি বীরপুরুষ। কিন্তু জিভের জলকে একটু শাসন করতেই হবে। কারণ এরপর আছে অ্যাপেটাইজার। তারপর মেন কোর্স, ডেজার্ট। অ্যাপেটাইজারের মধ্যে নতুন ইনোভেটিভ পদের সবগুলো যদি চাখতে চান তাহলে আর মেন কোর্স অবধি যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার ভুঁড়ির বহরের উপর। বহর যদি যুৎসই হয় ডেজার্ট অবধি দৌড়ে চলে যেতে পারবেন। রাজেশ দুবে মহাশয় অ্যাপেটাইজারের যে তালিকা দিলেন তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিন। ওক টসড বেবিকর্ন অ্যান্ড মাশরুম উইথ পিক্সিয়াং বিন সস, হট অ্যান্ড সফ্ট কর্ন কিউব, স্টিমড প্রনস্ উইথ গার্লিক— আরও আছে। সেটা মেনল্যান্ড চায়নায় গিয়ে ঢুঁ মারলেই ভাল। এইসব নতুন ইনোভেটিভ চাইনিজ পদগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, এইসব রান্নার ক্ষেত্রে চিনে রান্নার সঠিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্টার ফ্রাইং, স্টিমিং এবং ক্লে পট পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি খাবারের খাদ্যগুণকে ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু খাদ্যগুণ, স্বাস্থ্যসম্মত এ তো বায়ুসেবীদের কথা। যারা প্রকৃত খাদ্যরসিক তাদের কাছে স্বাদই আসল কথা। স্বাদ যদি লা-জবাব হয় বয়েই গেল তার খাদ্যগুণ নিয়ে মাথা ঘামাতে। এইসব ভূরিভোজের প্রধান কর্তা রাজেশ দুবে কে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম, আসল রহস্যটা কী? তিনি বেশ বিনীতভাবে অথচ আলাদিনের হাট খোলার ভঙ্গিতে বললেন, চাইনিজ রান্নার স্বাদ-গন্ধ-বর্ণের প্রধান উপকরণ সস। সঠিক রান্নায় সঠিক সস ব্যবহার করলেই কেল্লাফতে। এবং মেনল্যান্ড চায়নার হেঁসেলে যে সস ব্যবহার করা হয় তার বেশিরভাগই চাইনিজ হার্বাল সস। এবং চিনের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আনা। তবুও বাজার চলতি নানা ধরনের চিনে উপকরণ দিয়ে ট্রাই করতে পারেন মেনল্যান্ড চায়নার এই দুটি চাইনিজ রেসিপি— **বেবিকর্ন অ্যান্ড মাশরুম পিক্সিয়ান চিলি** এবং **ফ্রায়েড চিকেন উইথ গার্লিক**। মেনল্যান্ড চায়না-য় ঘুরে এসে জানালেন **বুবুন চট্টোপাধ্যায়**

চিলি গার্লিক নুডুলস

উপকরণ : ২ টেবল চামচ সাদা তেল, ১/৪ কাপ কুচনো পেঁয়াজ পাতা, ২ কাপ সেদ্ধ নুডুলস, ১/৪ কাপ চিলি-গার্লিক সস, স্বাদমতো নুন, ১ টেবল চামচ চিলি অয়েল।

প্রণালী : কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তেল বেশ ভাল গরম হলে কুচনো পেঁয়াজ পাতা, সেদ্ধ করা নুডুলস, চিলি-গার্লিক সস এবং নুন দিয়ে কড়া আঁচে কয়েক সেকেন্ড রাখুন। এরপর নামানোর আগে ওপরে চিলি অয়েল ছড়িয়ে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ম্যাঙ্গো আইসক্রিম

উপকরণ : ছোট টুকরো করা ২ কাপ কুচনো আম, ১.৫ কাপ মিহি চিনি, ২ টেবল চামচ লেবুর রস, ১.২৫ কাপ নারকেল দুধ, গার্নিশিং-এর জন্য মিহি করে ভাজা নারকেল কুচি, সামান্য পুদিনাপাতা কুচনো।

প্রণালী : একটা বড় পাত্রে আমের টুকরোয়, চিনি মাখিয়ে আগের দিন রাত্রে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। পরের দিন একটি মাঝারি মাপের সস্‌প্যানে মাঝারি আঁচে চিনি মেশানো আমের টুকরোগুলো জ্বাল দিন। মিনিট পাঁচেক জ্বাল দেওয়ার পর গ্যাস থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এবার পুরো মিশ্রণটা ব্লেন্ডারে দিয়ে একটি মিক্সচার তৈরি করুন। তারপর লেবুর রস দিয়ে আর একবার ব্লেন্ডারে ঘোরান। এর ঢাকা দিয়ে অন্তত একঘণ্টা রেফ্রিজারেটারে রাখুন। রেফ্রিজারেটার থেকে বের করে আইসক্রিমটি স্কুপে তুলে বোলে ঢেলে উপরে ভাজা নারকেল কুচি ও কুচনো পুদিনাপাতা দিয়ে সার্ভ করুন।

ফ্রায়েড চিকেন উইথ গার্লিক

উপকরণ : চিকেন ব্রেস্ট (ছোট ছোট কিউব) ৩০০ গ্রাম, ১/২ টেবল চামচ আদাবাটা, ১ টেবল চামচ রসুন বাটা, ১/২ টেবল চামচ শুকনোলংকা বাটা, ১ টেবল চামচ টম্যাটো কেচ্‌আপ, ১ টেবল চামচ অয়েস্টার সস, ১ টেবল চামচ চিলি পেস্ট, ১ টেবল চামচ চিলি অয়েল, ১ টেবল চামচ হোইসিন সস, একটি ডিমের অর্ধেক সাদা অংশ, ১/২ টেবল চামচ লংকাগুঁড়ো, ১ টেবল চামচ ভাজা ধনেগুঁড়ো, ১/২ টেবল চামচ কুচনো ধনেপাতা, স্বাদমতো নুন, স্বাদমতো চিকেন কিউব, প্রয়োজনমতো পট্যাটো স্টার্চ, ১ টেবল চামচ সাদা মরিচগুঁড়ো, ১ টেবল চামচ কুচনো পেঁয়াজপাতা এবং ম্যাগি সিজনিং মশলা প্রয়োজনমতো।

প্রণালী : সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাংস মেখে আগের দিন রাত থেকে ফ্রিজে রেখে ম্যারিনেট করতে হবে। পরের দিন মশলা মাখানো চিকেন কিউবগুলো পট্যাটো স্টার্চ মাখিয়ে ডিপ ফ্রাই করুন। এরপর সেগুলো তুলে অন্য একটি কড়াইতে ১/২ টেবল চামচ সেসমি অয়েল (তিল তেল) দিয়ে আদা, বসুন দিয়ে আগের ভাজা মাংসের টুকরোগুলো আর একবার নেড়ে নিন। নামানোর আগে কুচনো পেঁয়াজ পাতা ছড়িয়ে দিন।

বেবিকর্ন অ্যান্ড মাশরুম পিক্সিয়ান চিলি

উপকরণ : বেবিকর্ন ১০০ গ্রাম, মাশরুম ১০০ গ্রাম, সাদা তেল ১৫০ মিলি, ৩টি শুকনোলংকা কুচনো, ১ টেবল চামচ আদাবাটা, ১ টেবল চামচ রসুন বাটা, ১/২ টেবল চামচ কুচনো সেলেরি, ১ টেবল চামচ চিলি বিন পেস্ট, স্বাদমতো সাদা মরিচগুঁড়ো, ১ চা চামচ নুন, স্বাদমতো চিনি এবং ১০ গ্রাম কুচনো পেঁয়াজ পাতা।

প্রণালী : প্রথমে বেবিকর্ন এবং মাশরুম চৌকো করে কেটে ভাল করে গরম জলে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে দুটোই মচমচে করে ভেজে নিন। এরপর কড়া নামিয়ে মাশরুম এবং বেবিকর্ন একটি পাত্রে রেখে আবার দু'চা চামচ তেল দিয়ে বাকি উপকরণ ভাল করে নেড়ে নিন। নামানোর আগে গার্নিশিংয়ের জন্য উপরে কুচনো পেঁয়াজ পাতা ছড়িয়ে দিন।

ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম আধসেদ্ধ বাসমতী চাল, ১/৪ কাপ আধসেদ্ধ কুচনো বিনস, ১/২ কাপ কুচনো ক্যাপসিকাম, ১/৪ কাপ কুচনো বাঁধাকপি, ১/৪ কাপ সরু করে কাটা বেবিকর্ন, ২ টেবল চামচ কুচনো সেলেরি, ৩ টেবল চামচ চাইনিজ ফাইভ স্পাইস পাউডার (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়), ২ টেবল চামচ সয়া সস, ১ টেবল চামচ চিলি সস, ২ টেবল চামচ সাদাতেল, স্বাদমতো নুন।

প্রণালী : কড়াইয়ে কড়া আঁচে তেল গরম করুন। গরম তেলে সমস্ত কুচনো সবজি দিয়ে দু'মিনিট নাড়ুন। তারপর সেদ্ধ করা চালটি কড়াইয়ে দিয়ে তাতে চাইনিজ ফাইভ স্পাইস পাউডার, সয়া সস, চিলি সস এবং নুন মিশিয়ে মিনিট পাঁচেক ভাল করে নাড়ুন। ব্যাস তৈরি ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন। ⌘⌘

কেনাকাটা

পুজোর আর ৬২ দিন বাকি। হাতে সময় থাকলে অনেকে এখনই শপিং সারছেন। এতে গুছিয়ে শপিংও হবে। আর নামী আউটলেটগুলো সেল দেওয়ায় দামি ব্র্যান্ড সহজ লভ্য হবে। কোন দোকানে, কত শতাংশ ছাড়ে, কোন জিনিস, কী দামে পাবেন তারই খবর দিচ্ছেন **উপালি সাহা**

সেল চলছে

উডল্যান্ড— পুজোর ভিড়ে নিজের দিকে নজর কাড়তে বেছে নিন উডল্যান্ডের লেটেস্ট টি-শার্ট, ফর্মাল হাফ এবং ফুল শার্ট, ডেনিম, কডরাইজ ট্রাউজার ও অ্যাকসেসরিজ। টি-শার্টের মধ্যে কলার আর রাউন্ড নেক ইন থিং। ফর্মাল শার্টে এবারের চাহিদা উজ্জ্বল সবুজ, লাল, বাদামি রঙের চেকস। সাদা আর কালো তো আছেই। সিংগল কালারে বেশি চলছে পিঙ্ক, ফুশিয়া, সি-গ্রিন, বেজ, আর্থি টোন। এছাড়া, পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও রয়েছে শর্ট ও ফর্মাল শার্ট, ট্রাউজার, জিনস। সবেতেই পাবেন ফ্ল্যাট ৪০ শতাংশ ছাড়। ছেলেদের মাল্টি কালারড চেকস শর্টসে রয়েছে ৫০ শতাংশ ছাড়। প্রতিটি পোশাক পিওর কটন আর লিনেনের। লেডিজ ব্যাগ, ওয়ালেট, বেল্টেও থাকছে ২০ শতাংশ ছাড়।

বি-এথনিক— উৎসব মানেই মানবী শরীর বেয়ে গ্ল্যামার চুঁইয়ে পড়া। এর জন্য রয়েছে বি-এথনিকের পোশাক। আউটলেটটিতে রয়েছে হালফিলের কুর্তি, লেগিনস, পাটিয়ালা, দোপাট্টা, লং স্কার্ট, টপ, ব্যাগ। ফুল আর হাফ স্লিভের কুর্তিতে রয়েছে প্যাচ ওয়র্ক, সিক্যুয়েন্স, সুতোর কাজ আর নানা রকমের ফ্লোরাল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, জ্যামিতিক মোটিফ। রঙের মধ্যে ফুশিয়া পিঙ্ক, শকিং গ্রিন, সাদা, কালো, ব্রাইট অরেঞ্জের চাহিদা বেশি। এতে ৩০-৪০ শতাংশ ছাড়। প্রতিটি আইটেম সুতির। দোপাট্টা পাবেন মিররওয়র্ক, বিডস, হ্যান্ড পেন্ট, প্লিটার, সিক্যুয়েন্সের কাজের। ছাড় ২০-৩০ শতাংশ। সিংগল কালারের লেগিনস, পাতিয়ালা হোক বা পাতিয়ালায় থাকুক প্লিটার, জরি, সুতোর কাজ বা ছিমছাম, এলোমেলো মোটিফ— সবেতেই ছাড় ২০ শতাংশ। লং স্কার্টে ট্রেন্ড ফ্লোরাল আর অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্ট। ছাড় ৫০ শতাংশ। কুর্তি ৫০০ টাকা, দোপাট্টা ৩৯৯ টাকা, লেগিনস, পাতিয়ালা ৫৪৯ টাকা, স্কার্ট ৮৯৯ টাকা আর ব্যাগ ৫০০ টাকা থেকে শুরু। ব্যাগে থাকছে ৫০ শতাংশ ছাড়।

সাকসেস— পুজো বা ক্যাজুয়াল ডে, যে কোনওদিন ওয়েল ড্রেস-আপ চাইলে নিজেকে সাজান সাকসেস-এর মেন'স ওয়্যারের স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্ট কোট, ফুল আর হাফ স্লিভ শার্ট, টি-শার্টে। সঙ্গে জিনস, ট্রাউজার তো রয়েছেই। ওয়েস্ট কোট, স্যুট, ব্লেজারের ওপর ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। পাবেন কালো, গাঢ় নীল, গ্রে আর সাদা রঙে। দাম শুরু যথাক্রমে ১,৩৯৫, ৪,৩৯৫ এবং ৪,৫৯৫ টাকা থেকে। ফুল ও হাফ স্লিভ শার্ট চলছে একরঙা বা নানা রঙের চেকস, সিংগল কালার আর স্ট্রাইপের ওপর। ৮৯৫ টাকা থেকে দাম শুরু। টি-শার্ট মিলবে ব্ল্যাক, ব্লু, মেরুন, হোয়াইট, পার্পল, অরেঞ্জ, গ্রে রঙে। দাম শুরু ৪৯৫ টাকা থেকে। ট্রাউজারে প্লেন আর স্ট্রাইপডের চাহিদা বেশি। ৮৯৫ টাকা থেকে দাম শুরু। ব্ল্যাক, ডেনিম ব্লু, সাদা, হালকা সবুজ জিনসের প্রাইজ ট্যাগ শুরু ১,০৯৫ টাকা থেকে। সবেতেই ৩০ শতাংশ ছাড়। পাশাপাশি বেল্ট, কাফলিঙ্ক, ওয়ালেট আর টাইতেও সাকসেস দিচ্ছে ৫০ শতাংশ ছাড়।

রিড অ্যান্ড টেলর— মানেই আভিজাত্য আর ঐতিহ্যের শেষ কথা। যে সব পুরুষ নিজেকে ওয়েল গ্রুমড করতে ভালবাসেন তাদের ফার্স্ট চয়েস অবশ্যই রিড অ্যান্ড টেলর। এখানে পাওয়া যাচ্ছে হাফ আর ফুলস্লিভ শার্ট, স্যুট, ব্লেজার ও ট্রাউজার। দু'ধরনের শার্টেই থাকছে সিংগল আর মাল্টি চেকস। এবং সিংগল ব্রাইট কালার। দাম শুরু ১,৫৯৫ টাকা থেকে। স্যুট এবং ব্লেজার দুটোই পাবেন ব্ল্যাক, ব্লু, ব্রাউন আর গ্রে কালারের। আপাতত ক্রেতার চাহিদা প্লেন আর স্ট্রাইপড মেটিরিয়াল। দাম শুরু ৭,০০০ টাকা থেকে। ট্রাউজারের দাম শুরু ১,৬৯৫ টাকা থেকে। কালো, নীল, বাদামি আর গ্রে— এই চারটি রঙের প্লেন ও স্ট্রাইপড মেটিরিয়াল রাখে এরা। সমস্ত কিছুর ওপরই থাকছে ফ্ল্যাট ৪০ শতাংশ ছাড়।

জন প্লেয়ার— পুজোয় পুরুষরাও পেতে চান গ্ল্যাম লুক আর 'হাই হ্যান্ডসাম' কমপ্লিমেন্ট। এর জন্য রয়েছে জন প্লেয়ারের ফর্মাল হাফ আর ফুল স্লিভ শার্ট, ক্যাজুয়াল টি-শার্ট। বটম ওয়্যারের জন্য জিনস আর ট্রাউজার। ফর্মাল শার্ট মানেই লম্বা স্ট্রাইপড, মাল্টি বা একরঙা চেকস। একরঙা চেকসে সাদা, কালো, সবুজ বা লালের প্রাধান্য বেশি। মাল্টি কালারে পার্পলের সঙ্গে সাদা, পিঙ্ক- সাদা, সাদা-লাল বা লাল-কালো চলছে ভাল। ক্যাজুয়াল টি-শার্টে সিংগল কালার আর স্ট্রাইপ দুটোই হট ফেভারিট। আড়ি, চওড়া, একরঙা বা মাল্টি কালারের স্ট্রাইপ ইন। দুটোরই দাম শুরু ৮৯৯ টাকা থেকে। সঙ্গে থাকুক পছন্দের জিনস বা ট্রাউজার। কালো, নীল বা গ্রে রঙের। দুটোরই দাম ১,০৯৯ টাকা থেকে শুরু। সব আইটেমেই ৪০ শতাংশ ছাড়। ⌘⌘

হোম টাউন

পুজোয় ঘর-বাড়ি সাজাতে চলে আসুন ফিউচার গ্রুপের হোম টাউনে। আগস্ট মাস জুড়ে 'মানো ইয়া না মানো সেল'-এ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে নতুন ফার্নিচার এবং হোম অ্যাকসেসরিজের ওপর। এছাড়াও, আকর্ষণীয় অফার আর ডিসকাউন্ট মিলছে নতুন সোফা, বেড সেট এবং ফ্লেক্সি ওয়ার্ডরোব রেঞ্জে। আরও অনেক কিছু রয়েছে আপনাদের জন্য। যেমন, বেড সেট কিনলে সোফা সেট এবং একটা বেডশিট কিনলে আর একটা বেডশিট ফ্রি-তে পাবেন। মিলানো সোফাসেটে ৪৫ শতাংশ, কসমিক লাউঞ্জারে ৩৫ শতাংশ, লোরেট্টা সোফাসেটে ৪৬ শতাংশ, ওয়াল ইউনিটে ৫৫ শতাংশ, সেন্টার টেবলে ৪৩ শতাংশ, বেড সেটে ৬৪ শতাংশ, ক্রকারি আর হার্ডওয়্যারে ৪০ শতাংশ, কিডস বেডরুম ফার্নিচারে ৫৯ শতাংশ, নির্দিষ্ট কিছু ডেকর লাইটে ৬৫ শতাংশ ছাড় থাকছে।

সন্দীপ রায়ের নতুন ছবিতে ফেলুদার বদলে ভূত

উপালি সাহা

বেশ ফেলুদাকে নিয়ে একের পর এক বুদ্ধিদীপ্ত ছবি করছিলেন! শেষে সন্দীপ রায়ও ভূতের শরণাপন্ন! অনীক দত্তের 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-র সাফল্যে ইনফ্লুয়েন্সড কি তিনিও? শুনে ভরাট গলায় প্রচণ্ড হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, অস্বীকার করার তো উপায় নেই, এখন ভূতের ভবিষ্যৎ সত্যিই ভাল। যদিও এটাই আসল ঘটনা নয়। প্রথমত, 'জটায়ু' বিভু ভট্টাচার্য নেই। সব্যসাচীর বয়স ফেলুদার তুলনায় বেশি হয়ে গেছে সুতরাং ফেলুদার টানটান ব্যাপারটাও আর ওঁর মধ্যে নেই। এই দুটো চরিত্র আবার নতুন করে খুঁজতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। দ্বিতীয়ত, গত বছর ভেঙ্কটেশ ফিল্মস দুটো ছবি বানানোর অফার দিয়েছিল। তখনই ভূতের ছবি তৈরির কথা বলি। কিন্তু ওরা ফেলুদাকে নিয়ে আগে কাজ করার অনুরোধ জানায়। সেই মতো তৈরি হয় 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'। স্বাভাবিক ভাবেই এবার কিউতে দাঁড়িয়ে ভূত। সঙ্গে আরও যোগ করলেন, আমাদের ঘরানায় 'ভূত' নতুন কিছু নয়। বাবা (সত্যজিৎ রায়) ভূত নিয়ে বড়পর্দায় 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' আর ছোটপর্দায় 'সত্যজিতের গপ্পো' পরিচালনা করেছিলেন। আমিও ছোট থেকেই ভূতের ভক্ত। তাই অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল ভূত নিয়ে কিছু করার।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। গত দু'মাস ধরে প্রচুর ভূতের গল্প পড়ে ফেলেছেন। এই তালিকায় বিদেশি লেখকের সঙ্গে শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। অনেক হরর ফিল্মও দেখেছেন। যেমন, 'দ্য আনওয়ান্টেড', 'দ্য হন্টিং' ইত্যাদি। কিন্তু কোনওটাই তাঁকে হন্ট করেনি। শেষে সত্যজিৎ রায়ের তিনটি ছোট গল্প 'অনাথবাবুর ভয়', 'ব্রাউনসাহেবের বাড়ি', 'লক্ষ্ণৌয়ের ডুয়েল' আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূত-ভবিষ্যৎ'— এই চারটি গল্প নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন সন্দীপ।

তাঁর ছবিতে ভূত হবে মজারু। আবার চারটে ২০-২৫ মিনিটের গল্পকেও যেহেতু জুড়তে হবে একসুতোয়, তাই একজন গল্পকারও থাকবেন। এর জন্য তিনি সত্যজিৎ-সৃষ্ট তারিণীখুড়োকে ধার নিয়েছেন। সন্দীপের কথায়, এমন একজন চরিত্র খুঁজছিলাম, যে জমিয়ে গল্প বলতে পারে। তার গল্প বলা শেষ হওয়ার পরেও শ্রোতা স্পেলবাউন্ড হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। এমনকী ভাবতেও ভুলে যাবে, গল্পটা গাঁজাখুরি না সত্যি। এটা পারেন একমাত্র তারিণীখুড়ো। সুতরাং আমার ছবির সূত্রধর তিনি-ই।

কিন্তু এই প্রজন্ম তো গল্প শোনার থেকে নেট সার্ফিং আর মোবাইল ঘাঁটাঘাটিতে বেশি আগ্রহী! এখানেও পথ মেরে রেখেছেন পরিচালক। ছবিতে সেল ফোন, নেটের আগের প্রজন্মকে ধরেছেন। না হলে তারিণীখুড়ো কাদের রসিয়ে গল্প বলবেন? ছবিটা কি তবে শুধুই ছোটদের জন্য? না, সন্দীপের লক্ষ্য ফেলুদার দর্শক। অর্থাৎ সেই ইয়ং অ্যাডাল্ট গ্রুপ। এই প্রসঙ্গে ওই বয়সের এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন— বাবা তখন 'মণিহারা' করছেন। একদিন ড্রয়িংরুমে হঠাৎ দেখি, আস্ত কঙ্কাল নিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে। গোটাটাই অবশ্য প্লাস্টার অব প্যারিসের। আর তাতে সুতো বাঁধা। যাতে ইচ্ছে মতো নাড়ানো যায়। পরে 'মণিহারা' দেখতে গিয়ে বুঝলাম, ফণিভূষণের হাত থেকে কঙ্কালের গয়না কাড়ার ঘটনার পুরোটাই বাবার কারসাজি। তবুও দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সেদিন শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের চোরাস্রোত নেমেছিল।

ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে ৫ আগস্ট থেকে। প্রথম শ্যুট হচ্ছে বোলপুরে। 'অনাথবাবুর ভয়' আর 'ভূত-ভবিষ্যৎ'-এর। কালিম্পঙে হবে 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি'। 'লক্ষ্ণৌয়ের

কাহিনি সংক্ষেপ

অনাথবাবুর ভয়— গল্পে অনাথবাবু রঘুনাথপুরের দক্ষিণ প্রান্তে দু'শো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় হালদারদের জমিদার প্রাসাদে ভূত দেখবেন বলে পাঁচ সেলের টর্চ আর এক শিশি কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে ভর সন্ধেয় ঢুকে পড়েন একদম একা। তারপর...

ব্রাউনসাহেবের বাড়ি— ১৮৫৮ সালে লেখা এক ডায়েরির সূত্র ধরে ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজে সাইমনের ভূত দেখতে বেরিয়েছে তিন বন্ধু, ভরা সন্ধেয়। উদ্দেশ্য একটাই, '...সেখানে এখনো সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা ভূতকে দেখা দেয়?'...

লক্ষ্ণৌয়ের ডুয়েল— উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে এই গল্প। এক ডুয়েল লড়াইয়ে মৃত্যু হয় দুই সাহেবের। যিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং যিনি তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর ভোরের লক্ষ্ণৌ শহরের প্রান্তে দিলখুশার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছের একটা মাঠে, তেঁতুলগাছের নিচে ডুয়েল লড়েন সেই দুই সাহেব ভূত। আর তা স্বচক্ষে দেখতে ভোর পাঁচটায় মাফলার জড়িয়ে কুয়াশা ঢাকা দিলখুশার উদ্দেশ্য রওনা দেন তারিণীখুড়ো...

ভূত-ভবিষ্যৎ— এই কাহিনির ভূতও সিপাহি যুদ্ধের আমলের। এখানে কাহিনি কথকেরও ভূত দেখার বাসনা প্রবল। 'দেশলাই জ্বালিতেই চোখে পড়িল কে একজন তক্তপোশের পাশে বসিয়া আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দু'টো আগ্রহ ভরা চোখ। চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কে?' সঙ্গে-সঙ্গে মূর্তিটা মিলাইয়া গেল। আবার দেশলাই জ্বালিলাম। কেহ নাই'...

ডুয়েল' হবে লক্ষ্ণৌতে। তারিণীখুড়োর ভূমিকায় পরান বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দীপের ভাষায়, ওই চরিত্রে পরানদা ছাড়া আর কাউকেই ভাবা যায় না। স্পেশাল ব্র্যান্ডের বিড়ি মুখে বৈঠকখানায় জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার মেজাজ পর্দায় ঠিকমতো ফোটাতে পারবেন শুধুমাত্র পরানদা। রয়েল বেঙ্গলে একদম অন্য ধরনের চরিত্রে কী সাবলীল অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিতে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও আছেন। তাঁকে দেখা যাবে 'ভূত-ভবিষ্যৎ'-এ লেখকের চরিত্রে। শাশ্বত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, আমার তোপসেদের (শাশ্বত, সাহেব, পরমব্রত) এখন বাজার বেশ গরম। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ভাল অভিনয় করছে। বিশেষ করে অপু তো ব্রিলিয়ান্ট। আর আমি পুরনো টিম নিয়ে কাজ করতে বেশি স্বচ্ছন্দ। রয়েছেন, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কেমন লাগছে সন্দীপ রায়ের ছবিতে আবার ডাক পেয়ে? এ বিষয়ে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকপট স্বীকারোক্তি, ভাবতেই পারিনি উনি আবার ডাকবেন। একসময়, সবার মতো আমারও দারুণ ইচ্ছে করত, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করার। তা আর হয়ে ওঠেনি। ফলে বিশাল অভিমান জমা ছিল। সন্দীপ ডাকতেই তা মুহূর্তে গলে জল। রয়েল বেঙ্গলের পর তারিণীখুড়ো। আমার অভিনয় জীবনের এক একটা মাইলস্টোন এগুলো। আপ্রাণ চেষ্টা করব ঠিকঠাক তারিণীখুড়ো হয়ে ওঠার। একই অনুভূতি শাশ্বতরও— বাবুদার সঙ্গে আগেও কাজ করেছি। ওঁর সঙ্গে কাজ করা মানে ছবির খুঁটিনাটি অনেক কিছু শেখা। লোকেশনে কস্টিউম, খাওয়া সবকিছুর নজর রাখেন বউদি। ওঁদের সঙ্গে থাকলে পরিবার থেকে দূরে থাকার অভাব একটুও টের পাই না।

আপাতত সন্দীপ রায়ের সমস্ত মনোযোগ ভূতকে ঘিরে। ছবিতে 'মণিহারা'-র সেই শিরদাঁড়া কাঁপানো অনুভূতিটাই, যা আজও ভুলতে পারেননি, আবার ফেরানোর চেষ্টায় তিনি। তারপর হয়তো হাত দেবেন সত্যজিতের আরও এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি প্রফেসর শঙ্কুর চিত্রায়ণে। যেখানে মূল চরিত্রে বাঙালি অভিনেতা থাকবে। আর গল্পের প্রয়োজনে সঙ্গত করবেন অনেক বিদেশি অভিনেতাও।

সিনেমার আলোচনা

মুক্তধারা

কাকলি চক্রবর্তী

আকাশ ঝেঁপে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। আর বৃষ্টির সেই মুক্তধারায় ধুয়ে যাচ্ছে সব পাপ, সব স্খলন। দস্যু রত্নাকরের খোলস ছেড়ে জন্ম নিচ্ছে বাল্মীকি। এমন একটি দৃশ্য মুগ্ধ, বিমোহিত দর্শকের চোখকেও সিক্ত করে, দর্শকও যেন সেই মুক্তধারায় অবগাহন করেন। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বাংলা ছবি 'মুক্তধারা'র আলোচনা করতে বসে এই দৃশ্যটাই আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে রাখার মতো আরও অজস্র দৃশ্য ছড়িয়ে আছে সমগ্র ছবিটিতে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' নৃত্যনাট্যের মঞ্চসজ্জা। ওই বিপুল রঙের ব্যবহার, ভাবা যায় না।

সংশোধনাগারের বন্দিদের দিয়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নৃত্যনাট্য করালেন নীহারিকা চ্যাটার্জি।যি নি নিজেকে তাঁর আইনজীবী স্বামী অরিন্দম চ্যাটার্জির সংসারের কারাগারে এক বন্দি বলেই মনে করেন।এক অর্থে হয়তো তাঁর ভাবনা যথার্থ। এই নৃত্যনাট্যে সঙ্গে ছিল তাঁর মূক ও বধির কন্যা। যাঁর নির্দেশে নীহারিকা এই কাজটি করছেন তিনি পুলিশের আইজি, এই সংশোধনাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিজমোহন দত্ত। এই কাহিনিতে যে অংশটি প্রকৃত অর্থেই বাস্তব তা হল সংশোধনাগারের বন্দিদের দিয়ে অনুষ্ঠান করানো। অলকানন্দা রায় সত্যিই এই অসাধ্যসাধন করেছেন। তাঁর পরিচালনায় কয়েদিরা 'বাল্মীকি প্রতিভা' বাইরেও 'শো' করে থাকে।

কাহিনি এগিয়েছে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা, রিহার্সাল, সংশোধনাগারের আবাসিকদের দিনযাপন, নীহারিকার পারিবারিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। না, প্রথমে বর্ণিত দৃশ্যের ধারাপাতনেই রত্নাকরের মনের ক্লেদ ধুয়ে মুছে যায়নি। আধুনিক রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে উঠবে কিনা সেই টানাপোড়েন চলেছে ছবি জুড়ে। আর দর্শক থেকেছেন উৎকণ্ঠ। সতিই অসাধারণ।

শুরুতে যে গান শুধুই সুরে ছিল, সমাপ্তিতে তাই ফিরে এল সুরে ও কথায়। 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। আর একবার প্রমাণিত হল রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের গতি নেই। বাল্মীকি প্রতিভার প্রায় প্রতিটি সংলাপ বা গান যাই বলি না কেন, চিত্রিত হয়েছে দ্বৈত অর্থে। একেই বোধহয় বলে সার্থক বিনির্মাণ। ছবিটির দুই পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়কে ধন্যবাদ।

নীহারিকার ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সম্পর্কে কিছুই বলার নেই, তিনি আর একবার দেখালেন তাঁর পরিধির বিস্তার। ব্রাত্য বসুর অরিন্দম বেশ ভাল। বিশেষ করে মনের মুক্তি ঘটার কালে তাঁর সামান্য অভিব্যক্তিটা অসাধারণ। প্রধান ভূমিকা ইউসুফ রূপী নাইজেল আকারা অনবদ্য, বলেও বলতে হয়, তাঁর শরীরী বিভঙ্গ বা মুখের এক্সপ্রেশন যতটা আবিষ্ট করে সংলাপ প্রক্ষেপণ ততটা নয়। তার জন্য আরও অভ্যাস প্রয়োজন ছিল কি? বরং দেবশঙ্কর হালদার যিনি তাঁর সব অভিনয়েই আমাদের নির্বাক করে রাখেন, এখানে তাঁর অতি স্বাভাবিক অভিনয় কি তাঁকে সামান্য হলেও অ-বিশিষ্ট করেছে? আর অন্যতম পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হ্যাপি সিং দুর্দান্ত।

তবু দু'একটি কথা। ছবিটা আর একটু ছোট হতে পারত। যেমন ইউসুফদের বোধোদয়ের মুহূর্তে কী হলে কী হতে পারে সেটা অমন জনে জনে বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না। এবং ব্রিজমোহন ও তাঁর স্ত্রীর সংলাপ গোটা ছবিটার পরিপ্রেক্ষিতে একটু বানানো, সাজানো বলে মনে হয়েছে।

ভালবাসা, সমদর্শীতা পারে পাপীর মন থেকে পাপ ধুয়ে তাকে মুক্ত করতে, অথবা সঠিক পথ নির্বাচন মানুষকে সাংসারিক জালের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে পারে এই অনন্য বার্তাই ছবিটি পৌঁছে দিয়েছে মানুষের কাছে। ভাল লাগে,চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয়, তবু সংশয় যায় না, বাস্তবে সত্যিই কি এভাবে পাপীকে শুদ্ধ করা যায়? বা সাংসারিক জটিলতার মধ্যে ঘটে নারীমুক্তি? কী জানি!

রানিকাহিনি

দোয়েল দত্ত

অনেকদিন পর এই বছরটা হয়তো অন্যরকম কাটবে রানি মুখার্জির। কেন, সে কথায় না হয় পরে আসব। কিন্তু হঠাৎ আবার এতদিন পরে বলিউডের একদা রানিমা উদয় হলেন কেন? শেষ কবে যেন কোন সিনেমাটা বেরিয়েছিল সেটার নাম মনে করতে করতেই একবার দিল বোলে হাদিশ্না মনে আসছে তো পরক্ষণেই লাক বাই চান্স, তারপরেই জিভ কেটে বেরিয়ে আসছে নো ওয়ান কিলড জেসিকা নয় তো? তা এ হেন নায়িকা, যার কেরিয়ার সেই কবে গেছে গেছে বলে রব উঠেছিল, তাকে নিয়ে আবার এ বছর কীসের এত জল্পনা?

কারণ আছে। তার এক নম্বর কারণ এ বছর রানির দু দুটো ছবি রিলিজের পথে— আইয়া ও তলাশ। সেই ২০০৭ সাল থেকে চলছে কেরিয়ারে ভাটার টান, ২০০৮ থেকে বছরে মাত্র দুটো করে রিলিজ, '০৯ অবধি গল্পটা একইরকম রইল। থোড়া পেয়ার থোড়া ম্যাজিক, লাক বাই চান্স, সাওয়ারিয়া কোনওটাই বক্স অফিসে তেমন জমাতে পারেনি। ২০১০-এ তো একেবারে ফাঁকা ময়দানে খেলে নিলেন করিনা-প্রিয়াঙ্কারা। তারপর ২০১১ তে নো ওয়ান কিলড জেসিকা। ওই যে কথায় বলে না বিপদ যখন আসে সবদিক থেকে আসে, তো জেসিকাতে রানির থেকে বেশি ক্রেডিট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিদ্যা সাব্রিনা বালান। তবে একেবারে ব্যাকফুটে চলে যাওয়ার মেয়ে তো নন রানি। চেষ্টা চালিয়েছেন নিজের খুঁতগুলো খুঁজে বের করার, তারপর যে সব ভুলভাল স্ক্রিপ্টের জন্য কেরিয়ারে সাময়িক ভরাডুবি হয়েছিল, সেগুলোকে যথাসম্ভব পাল্টে, চোপড়া প্রোডাকশনের বাইরে বেরিয়ে আর প্রচুর ওয়ার্কআউটে ৩৪-২৪-৩৪-এর ধারেকাছে এসে এই বছর নিজেকে নতুনভাবে পর্দায় আনছেন তিনি।

আইয়া-তে রানির চরিত্রটি একটি মারাঠি মেয়ের, যার চরিত্রের মধ্যে স্বপ্ন আর বাস্তবতার এক অদ্ভুত মিশেল রয়েছে। ছবিতে তিনটি আইটেম নাচে রানি যা পারফর্ম্যান্স দেখিয়েছেন, তা নেশা ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কোরিওগ্রাফার বৈভবী মার্চেন্টের যোগ্য সাহচর্যে ক্লাসিক্যাল টাচে ইভানি নাচের বিভঙ্গকে যথাসম্ভব সেনস্যুয়াস করে তুলতে সেটে এসেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ প্র্যাকটিশ করছেন রানি। কেরিয়ারে মন্দা, চোপড়া ব্যানারের বাইরে যেতে নারাজ, শিডিউল নিয়ে নানারকম হুজ্জুতি, ছবির স্ক্রিপ্টে গডফাদারের (পড়ুন আদিত্য চোপড়া) নাকগলানো— এতসব ঝক্কি জেনেও রানিকেই নায়িকা হিসেবে বাছলেন কেন? আইয়ার পরিচালক সচিন কুন্ডলকর হাসতে হাসতেই বললেন, 'আসল ব্যাপারটা কী জানেন তো আমি নিজেও জানি না কত বছর ধরে আমি রানির সঙ্গে কাজ করতে চাইছি। লাকিলি এই স্ক্রিপ্টেই ওঁর আগ্রহ জন্মাতে সেটা হয়ে গেল। মেল লিডে আছে দক্ষিণের পৃথ্বী। দুজনকে চমৎকার মানিয়েছে।' কিন্তু বাকি চমকটা অবধি তো আমাদের ছবি রিলিজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। ছবিটির কো প্রোডিউসার অনুরাগ কাশ্যপ। যাক, তাহলে এতদিনে রানির সুদিন ফিরেছে, চোপড়াদের বাইরে বেশ বড় ব্যানারই পাচ্ছেন।

আইয়া রিলিজ হতে না হতেই হুড়মুড় করে মঞ্চ কাঁপাতে এসে পড়ছে আমির খানের তলাশ। এতদিন পর্যন্ত রানি যেসব বি গ্রেডেড স্ক্রিপ্ট শুধু পরিচালক দেখেই নির্ভাবনায় সই করতেন এবার বোধহয় তার ইতি ঘটবে। কারণ আমির খান মানেই তো একটু ভিন্ন ছাঁচ, সাহসী বিষয় আর নতুন চমক। এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারে রানির চরিত্রটি ডিটেকটিভের। করিনার সঙ্গে এ ছবিতে টেক্কা দিচ্ছেন রানি। লিখতে বসে বারে বারেই এখন মনে পড়ছে দিল তো পাগল হ্যায় ছবিতে করিশ্মা-মাধুরী ডুয়েল। পড়ন্ত বেলায় মিসেস নেনে যেভাবে করিশ্মাকে এক হাত নিয়েছিলেন সেই কেমিস্ট্রিটা রানির ক্ষেত্রেও যদি খেটে যায়! কোলাবার লিওপোল্ড ক্যাফে থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের বিভিন্ন রেডলাইট এরিয়ায় শুটিংয়ে ব্যস্ত আমির-রানি। গুলামের আতি কেয়া খান্ডালার যুগটাকে দুজনেই পিছনে ফেলে এসেছেন। অনেক ম্যাচিওরড দুজনেই। আমিরের সঙ্গে অনস্ক্রিনে বেশ ভালই মানিয়েছে রানিকে। পরিচালক রিমা কাটগি বেশ সন্তুষ্ট দুই নায়িকার ডেডিকেশনে। তবে করিনা না রানি দাঁড়িপাল্লাটা কার দিকে ঝোলে সেটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

প্রফেশনাল ফিল্ডে দীপিকা-প্রিয়াঙ্কা-অনুষ্কাদের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর যাবতীয় সুযোগ রানি পাবেন এই দুটো সিনেমাকে ঘিরেই। এবং এটাই শেষ। এতে বাজিমাত না করতে পারলে একদা কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সাথিয়া, হামতুমের হট নায়িকাকে ভবিষ্যতে নিছক হাই হ্যালো নয়, একেবারে হুশ করেই বেরিয়ে যাবে তামাম বলিউড। রানি বুদ্ধিমতী, এই সহজ সত্যটা জানেন। আর জানেন বলেই না আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে হিশ হিশ হুশ হুশ সম্পর্কটাকে বেশ মজবুত করে নিয়েছেন এই দু' বছরে। পায়েলের সঙ্গে আদিত্যর ডিভোর্সটা হলেই অ্যাডি চোপড়ার নামের সঙ্গে বাংলার জামাই ট্যাগটা আটকাতে আর দেরি হবে না। যশ আর পামেলা চোপড়াও একরকম মেনেই নিয়েছেন ছেলের আব্দার। আর অ্যাডি-রানিকে পায় কে, এতদিন না হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতেন, ইদানীং শপিং থেকে গসিপিং, উইকএন্ড ট্রিপ থেকে রেস্টুরেন্ট সর্বত্রই কপোত-কপোতী একসঙ্গে। সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে আদির পুরো পরিবারের সঙ্গে রানির ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার ছবি তাক করতে সাংবাদিকদের মধ্যে কি শোরগোলই না পড়ে গিয়েছিল! এই তো দিন দশেক আগের এক শুক্রবার রাত্রে বান্দ্রা ওয়েস্টের হাক্কাসনে দুজনে হাজির হয়েছিলেন রোমান্টিক ডিনারে, পাপারাৎজি অবশ্য খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যান, চুপচুপ রেস্তোরাঁতে ঢুকে কোণার টেবিলে বসে পড়েন দুজনে, ছিলেন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। আর তার মাত্র কিছু দিন আগেই আদিত্য চোপড়া রানিকে গিফট করেছেন অডি এইট।

তাহলে? তাহলে কি মুখার্জি বাড়িতে সুদিন ফিরল বলে! আশা করতে তো কোনও ক্ষতি নেই। সান্তাক্রুজে মাত্র দু মিনিটের পড়শি রানির বাড়িতে অ্যাডি শেহেরাতে এ বছর পৌঁছবে কি না তা জানা নেই, তবে কেরিয়ারে হয়তো তাঁর মোড় ঘুরতে পারে, এমনটাই ভাবছেন একদা নিন্দুকমহল। পেজ থ্রি-তে হাই প্রোফাইল সোসাইটি ইভেন্টের পর আবারও অনেকদিন পর এ বছর পুরনো ভূমিকায় রানিকে পাবে ইন্ডাস্ট্রি, তাদের হারিয়ে যাওয়া রাজকন্যেকে। পড়ন্ত শেষ বিকেলের আলোর মতো সে রাজকন্যের স্নিগ্ধতা নিশ্চয়ই এখন আরও মোলায়েম হয়েছে? হতেই হবে, না হলে আর বলিউডের রানি কীসের! ⌘⌘

জি টিভিতে 'রামায়ণ'

১৯৮৭-তে দূরদর্শনে রবিবার সকাল সাড়ে ন'টার স্লটে 'রামায়ণ' প্রথম টেলিকাস্ট করে হই-চই ফেলে দিয়েছিলেন রামানন্দ সাগর। টানা ৭৮টা এপিসোড দেখেছিল বাচ্চা-বুড়ো দল বেঁধে। কারণ, বইয়ে পড়া পৌরাণিক চরিত্রগুলোর জ্যান্ত উপস্থিতি ঘটেছিল পর্দায়। অনেকদিন পর আবার মহাকাব্যটির দেখা মিলছে জি টিভিতে। ১২ আগস্ট থেকে প্রতি রবিবার সকাল ১১টার স্লটে শুরু হয়ে গিয়েছে টেলিকাস্ট।

এতদিন পরে আবার রামায়ণ কেন? জি টিভির পক্ষ থেকে হেড কনটেন্ট অজয় ভালওয়ানকরের বক্তব্য, প্রতিদিন জেট গতিতে ছুটতে থাকা এই প্রজন্ম সেল, নেটের বাইরে কিছুই ভাবতে পারে না। তাদের জানা উচিত, আমাদের পূর্বসুরী কত সিম্পল লাইফ লিড করতেন। আর রামায়ণ এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণের মতো চরিত্রের আবেদন চিরন্তন। এঁরাই আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক-বাহক। তাই জি টিভি-র এই প্রয়াস। এছাড়া, ছোট থেকে বড় সবাই একসঙ্গে বসে টিভি দেখার মজাটাও আবার ফিরে পাবেন। পরবর্তী প্রজন্মও শো দেখে চিনবে ভারতীয় ঐতিহ্যকে।

তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-কেই পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে ধারাবাহিকটিতে। লক্ষ্মণের ভূমিকায় দেখা যাবে জি টিভির '১২/২৪ কারল বাগ'-খ্যাত নীল ভাটকে। নীলের মতে, আমার ছিপছিপে, অ্যাথলেটিক চেহারাই হয়তো চরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেছেন নির্মাতা। ধারাবাহিক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, ভীষণ সহজ ভাষায়, এযুগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। তাই ইয়ং অ্যাডাল্টদেরও ভাল লাগবে দেখতে। প্রাক্তন বিউটি কুইন এবং অভিনেত্রী শিখা স্বরূপ কৈকেয়ী চরিত্রে রয়েছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত এই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে। শিখা জানিয়েছেন, চরিত্রে এত শেড রয়েছে যে অভিনয় করে দারুণ ভাল লাগছে। অযোধ্যার রাজা দশরথ হয়েছেন ঋষভ শুক্লা।

এখানেই শেষ নয়। নেট সার্ফিং যাদের প্যাশন তাদের নজর কাড়তে জি টিভি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মন্দিরের ছবি লগ অন করেছে। এবং মাউস ক্লিক করলেই যাতে রামায়ণের নির্বাচিত দৃশ্য দেখা যায় তারও ব্যবস্থা করেছে।

স্টার প্লাসে

প্যায়ার কা দর্দ হ্যায়, মিঠা মিঠা প্যায়ারা প্যায়ারা

এক সময় 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া', 'হাম আপকে হ্যায় কৌন', 'হাম সাথ সাথ হ্যায়'-র মতো অনেক পারিবারিক ছবি উপহার দিয়েছেন রাজশ্রী প্রডাকশন। সম্প্রতি প্রডাকশন হাউজটি গাঁটছড়া বেঁধেছে স্টার প্লাসের সঙ্গে। তৈরি করেছে নতুন মেগা ধারাবাহিক 'প্যায়ার কা দর্দ হ্যায়, মিঠা মিঠা প্যায়ারা প্যায়ারা'। এখানে তোদের ছবির মতো পরিবারের ফ্লেভার প্রাধান্য পেয়েছে। জমজমাট এই ফ্যামিলি ড্রামায় থাকছে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের মতো মানবিক অনুভূতি।

মূল গল্প আদিত্য-পানখৌরিকে নিয়ে। আদিত্য এমন এক ভাঙা পরিবারে মানুষ যেখানে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারও জন্য কারও আন্তরিক টান নেই মনেতে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুব কাছের মানুষকেও তারা আঘাত করতে প্রস্তুত। এমনকী আদিত্যর মা-বাবাও কোনওদিন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেননি। এই রকম পরিবেশে বড় হওয়ায় আদিত্যের কাছে মানবিক সম্পর্কের প্রতি কোনও টান নেই। সে কোনও সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধাও পড়তে চায় না। এইভাবে যখন তার জীবন কাটছে আচমকা পানখৌরির সঙ্গে পরিচয়।

পানখৌরি যৌথ পরিবারের মেয়ে। পরিবারের সব সদস্য এক সুতোয় গাঁথা। ফলে পানখৌরি প্রচণ্ড প্রাণচঞ্চল। যা আদিত্যের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আদিত্য অর্ন্তমুখী। এই রকম বিপরীত মেরুর দুটো মানুষ এক সময় কাছাকাছি আসে। পানখৌরি তার সহজাত দক্ষতায় নিমেষে আপন করে নেয় আদিত্যকে। সব সময় তার পাশে থাকতে চায়। চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়তে চায় আদিত্যের সঙ্গে। কিন্তু আদিত্য কোনও স্থায়ী সম্পর্কে বিশ্বাসী নয়। আদৌ পানখৌরি কি আদিত্যকে স্থায়ী সম্পর্কের মূল্য বোঝাতে পারবে? জানতে গেলে দেখতে হবে স্টার প্লাস। সোম টু শুক্র রাত দশটার স্লটে।

স্টার প্লাসের বিজনেস হেড নীতিন বৈদ্য ধারাবাহিকটি সম্বন্ধে বললেন, স্টার প্লাস বরাবরই নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করে। এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাইছি এই সত্য— সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশে বড় হলে যে কোনও শিশুই পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। অর্থাৎ, শিশুর চরিত্র গঠনে তার পরিবারের ভূমিকা অনেকটা, এটাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু যে ছোট থেকেই অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়, তার স্বভাবে বিকৃতির ছায়া পড়তে বাধ্য। আদিত্যও সে রকমই একটা চরিত্র।

প্রযোজক সূরয বরজাতিয়া আর কবিতা বরজাতিয়ার মতে, এই প্রজন্ম কীভাবে জীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে হ্যান্ডেল করে তার ওপরেই আমরা বেশি জোর দিচ্ছি। সেই সঙ্গে পারিবারিক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরেও জোর দিয়েছি। আদিত্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগত নকুল মেহেতা। নকুল কিন্তু পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্কের ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তাই তাঁর কাছে নিজের চরিত্রের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয় ভীষণ বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও ধরাবাহিকে কাজ করছেন মুকেশ খান্না সহ বহু নামী অভিনেতা।

রূপসী বাংলায় 'শিবানী'

সাংবাদিক মানেই 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। ভয়, দ্বিধা, জীবন সংশয়ের মতো অনুভূতির কোনও জায়গা নেই এই পেশার ডিক্সনারিতে। শিবানী ঠিক এরকমই ডাকাবুকো মেয়ে। যেদিন থেকে সাংবাদিকতা শুরু করেছে, সেদিন থেকে খবরের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়া তার স্বভাব। এর জন্য কতবার প্রাণ সংশয় ঘটেছে। হুমকি দিয়ে অনেক উড়ো ফোনও এসেছে। কিন্তু শিবানীকে টলায় কার সাধ্যি? বাবা অভিষেক আর মা দেবী মেয়েকে নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকেন সব সময়। শিবানী নির্বিকার। এই চ্যালেঞ্জিং মনোভাবের জন্যই সে সাংবাদিক মহলে আলাদা জায়গা করে নিতে পেরেছে।

চুটিয়ে সাংবাদিকতা করতে করতেই একদিন সে স্বপ্ন দেখে, শিবাইতলা গেছে। মাকে বলতেই তিনি শিউরে ওঠেন। কারণ, শিবাইতলার সঙ্গে শিবানীর অতীতকালের সম্পর্ক। ওখান থেকেই সে সমাজসেবার কাজ শুরু করে। আর তাপসের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ঘটনাই তার জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। সাহসী সাংবাদিক বদলে যায় অনেকটাই।

কী সেই পরিবর্তন? আর বলা যাবে না। বাকিটা জানতে চোখ রাখতে হবে রূপসী বাংলায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মেগা ধারাবাহিক 'শিবানী'। পরিচালনায় অংশুমান প্রত্যুষ। বাইপাসের ধারের এক বাড়িতে বেশ অনেকটাই শুট হয়ে গেছে। অংশুমান মুম্বইবাসী। কিন্তু তরতরিয়ে বাংলা বলেন। ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকরির চেনা পথে না হেঁটে চলে এসেছেন ক্যামেরার পিছনে। মামা অনুভব সিন্‌হার 'দশ' আর 'ক্যাশ' ছবিতে সহ পরিচালক হয়ে হাত পাকিয়েই ধারাবাহিক পরিচালনায় নেমে পড়েছেন। শুটিংয়ের ফাঁকে জানালেন, ধারাবাহিকে সিনেমার ঝকঝকে প্রেজেন্টেশন আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

জনপ্রিয় 'রানি-কাহিনি' ধারাবাহিকের রানিকে আবার দেখা যাবে এই সিরিয়ালে। শিবানীর ভূমিকায়। এ ছাড়াও রয়েছেন— দেবশঙ্কর হালদার, রূপা ভট্টাচার্য, অশোককুমার প্রমুখ শিল্পী। মা-বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাপিয়া দেবরাজন। চিত্রনাট্য— প্রমিত ঘোষ। ক্যামেরায়— আয়ুব আলি। প্রযোজনা— ডাস্কি ফিল্ম। ⌘⌘

উপালি সাহা

শূদ্রকের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'দহনান্ত'

প্রদীপ মিত্র

দরজায় কড়া নাড়ে ভোর। সে কেমন ভোর? দরজার ভিতরে ওরা কারা? কোথাও কোনও শব্দ নেই। একসময় সশব্দে ভেঙে ফেলা হয় দরজা। এক মৃত্যুপথযাত্রীর কোলে এক মৃতা। বিশিষ্ট নাটককার ও নির্দেশক দেবাশিস মজুমদারের 'দহনান্ত' নাটকের করুণ ও কঠোর বাস্তবের ছবিটি ফুটে ওঠে এভাবে। আসলে বৃদ্ধ দম্পতির আত্মহননের শব্দ দরজার বাইরে পৌঁছয় না। ভোরের নৈঃশব্দে পথচারী মানুষের চলাফেরায় শব্দময় হয়ে ওঠে ওই দরজা। এই শহরে এরকম মৃত্যু তো প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এক ঘোর নিঃসঙ্গতা চেপে বসেছে এইসব একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনে। 'দহনান্ত'-ও সেই নিঃসঙ্গতা। সত্তরোর্ধ্ব অকিঞ্চন ও সাবর্ণীর সংসার। বড় ছেলে অভিরূপ আমেরিকায়। মেয়ে রত্নাশ্রী ও তার স্বামী রমিত দিল্লিতে। যোগসূত্র শুধু টেলিফোন। কখনও বেজে ওঠে নৈঃশব্দের অন্ধকার ভেঙে। সেখানেও লোভ আর লালসার কথা। জামাই রমিতের লক্ষ্য ওই বাড়ির প্রোমোটিং। ছোট ছেলে ধৃতিরূপ মাওবাদী। আত্মগোপন করে থাকে কোথাও। কখনও কখনও খবর আসে। একদিন আসে মৃত্যুর খবর। অসিতাযার ও দানসাগরের নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার তাঁর প্রখর বিশ্লেষণী ও যুক্তিগ্রাহ্য সংলাপে নাটকটির নির্মাণ করেছেন সময়ের প্রেক্ষিতে। সময় তাঁকে তাড়িত করেছে বারবার রাজনীতির অগ্নিস্পর্শে। এই রাজ্য, এই দেশ ও এই সময় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাওবাদী রাজনীতির। নির্দেশক দেবাশিস মজুমদার চিন্তা-চেতনার স্বর বনাম গোপনে হিংসার কথা বলার স্বরকে তুলে ধরেছেন। যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর আঙ্গিকে ও বিষয়ে। দিন যায়, রাত আসে। প্রতিদিনের অন্ধকার ও জীবনের ক্ষয় ক্রমশ গ্রাস করে তাদের। কোথাও এতটুকু স্বপ্ন নেই। আর্থিক সংগতিও একসময় নিঃশেষিত। ছোট ছেলের বন্ধু অলকেশের আগমন একেক সময় ধৃতিরূপের স্মৃতিকে তুলে ধরে। সাবর্ণী যেন তার ছেলে ধৃতিরূপকে পাঠ করে অলকেশের ভিতর। একসময় সবই কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। স্তিমিত হয়ে আসে। পরিচারিকা বকুল তাদের একমাত্র ভরসা হয়েও ব্যর্থ হয় একসময়। তাদের জীবনে নেমে আসে ভয়াল মৃত্যুর হাতছানি। অনিবার্য আত্মহনন। দুজনে একসঙ্গে। যে দহন, প্রকৃতপ্রস্তাবে, আর্থসামাজিক সংকটে চিহ্নিত। যে দহন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করে চলেছে এই সময়কে। যার শেষ কোথায় কেউ জানে না। দেবাশিস মজুমদার সেই তীব্র দহনকে পারিবারিক বৃত্ত থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক বৃত্তে। লালের রাজনীতি, প্রোমোটারের রাজনীতি, এ দল ও দলের লোভী চোখ কীভাবে আবর্তিত সেই বৃত্তে তারই জ্বলন্ত দহন 'দহনান্ত'। নাটকটির সৃজনে সংলাপের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অলকেশ ও অকিঞ্চনের সংলাপ এই সময়ের এক লিপিবদ্ধ প্রবন্ধের মতো থেকে যাবে। এবং শেষ পর্যন্ত হিংসার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই যে একমাত্র আশ্রয় তার ইঙ্গিতও রেখে যায় 'দহনান্ত'। সত্তরোর্ধ্ব অকিঞ্চনের চরিত্রেও গভীর ও দ্যুতিময় দেবশংকর। অলকেশ চরিত্রে প্রেমাংশু রায় দৃপ্ত। মঞ্চজুড়ে সেনাবাহিনীর পদচারণা, কখনও রেডিওতে পুরনো দিনের গান, সংলাপে প্রকৃতির সূত্র, যেমন সংসারের আকাশে সুতো ছেড়ে দিতে হয়। এ ধরনের উচ্চারণ নাট্যশরীরে সৃজিত রূপের ধ্বনি সঞ্চার করেছে। সাবর্ণীর ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া চরিত্রটিকে তুলে ধরেছেন ইন্দ্রাণী মৈত্র। নাটকের শেষ দৃশ্যে মঞ্চের অগ্নিময় রূপটি পরিচারিকা বকুলের সমস্ত উগরে দেওয়া জ্বালাকে তুলে ধরেছেন দেবাশিস মজুমদার। যেন এক অগ্নিবলয়ের ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। যার শান্ত সমাহিত রূপটি দেখতে চেয়েছেন সেই ধ্বংসের ভিতর। বকুল চরিত্রে সোমদ্যুতি চট্টোপাধ্যায় ভীষণ মর্মস্পর্শী। অন্যান্য চরিত্রে চন্দন চট্টোপাধ্যায়, মধুরাই মজুমদার, তপন মুখোপাধ্যায়, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম বসু, চন্দ্রশেখর পোদ্দার ও ইন্দ্রাণী ঘোষরা যথাযথ চরিত্রানুগ। বাদল দাসের আলো দেবাশিস মজুমদারের সৃজনের করুণ ও কঠোর বাস্তবতাকে অনুসরণ করেছে বস্তুত। গৌতম ঘোষের আবহ জটিল ও কুটিল সময়ের সাক্ষ্য হয়ে ধ্বনিত হয়ে যায়। ধ্বনিত হতে থাকে। ধ্বনিত হতে থাকে 'দহনান্ত'-র জিজ্ঞাসাগুলি। ⌘⌘

রোহন বোপান্না ও মহেশ ভূপতি

ক্যাবিনেটের ফাঁকা জায়গাটায় কী রাখবেন মহেশ?

অভিরূপ দত্ত

খেলা

এতদিন পর্যন্ত তিনি নায়কের মর্যাদা পেতেন। এখনও পাবেন। তবু, কোথাও যেন একটা কিন্তু বোধও হতে পারে আমাদের। অলিম্পিকের আগে তাঁর ভূমিকা দেখেই এই কিন্তু বোধের উদয়। তিনি মহেশ ভূপতি। ভারতীয় টেনিসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ডাবলস প্লেয়ার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বাদে বাকি তিনটি গ্র্যান্ডস্লামেই তিনি ডাবলস খেতাব জিতেছেন। মিক্সড ডাবলসে তাঁর রয়েছে কেরিয়ার স্লাম। এই বিভাগে চারটি গ্র্যান্ডস্লামই জিতেছেন দু'বার করে। ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে তাঁর মোট গ্র্যান্ডস্লাম খেতাবের সংখ্যা একডজন। একদা এটিপি ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে ছিলেন একনম্বরে। মোট ৫০টি এটিপি ডাবলস খেতাব তাঁর দখলে। দেশের হয়ে ডেভিস কাপেও তাঁর পারফরম্যান্স রীতিমতো তাক লাগানো। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমসেও দেশকে পদক এনে দিয়েছেন একাধিকবার। কিন্তু মহেশ ভূপতির বাড়িতে একটা পদক নেই। বলা ভাল, কোনওদিন সেই পদক থাকবেও না। তা হল অলিম্পিক পদক।

সম্ভবত জীবনের শেষ অলিম্পিক তিনি খেলে ফেললেন লন্ডনের মাটিতে। কারণ, চার বছর পর রিও-তে যখন গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের আসর বসবে, তখন তাঁর বয়স হবে ৪২। ততদিন কি তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার মতো অবস্থায় থাকবেন? ব্যাপারটা চূড়ান্ত অনিশ্চিত। এ নিয়ে তিনি নিজেও তেমন আত্মবিশ্বাসী নন। আর সে কারণেই এবার পদক জয়ের মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন মহেশ ভূপতি। বুকে চেপে রাখা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পরিকল্পনা শুরু করেন বছর দুয়েক আগেই। ২০১০ মরসুমের মাঝামাঝি সময়ই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ২০১১ সালে জুটি বাধবেন লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গে। তাঁর প্রস্তাবে সম্মতিও জানান লিয়েন্ডার। ভারতের সর্বকালের সেরা ডাবলস জুটির পেশাদার সার্কিটে প্রত্যাবর্তনের খবরে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল দেশের টেনিস মহলে। অনেকেই আশা করেছিলেন, টেনিসের পেশাদার সার্কিটে আবার দেখা যাবে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর জয় রথ। চেন্নাই ওপেনে চ্যাম্পিয়ন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার্স হয়ে মরসুমের শুরুটাও দারুণ করেছিলেন দুই ভারতীয় তারকা। জিতেছিলেন মিয়ামি এবং সিনসিনাটিতেও। তবু প্রত্যাশিত সাফল্য ধরা দেয়নি লি-হেশ জুটির র‍্যাকেটে। ফের ঝগড়া। এবং পরিণতি সেই বিচ্ছেদ। দু'জনেই বুঝেছিলেন 'বুড়ো' হার জোড়া হয়তো লাগে। কিন্তু, তা আগের মতো কর্মক্ষম থাকে না। দরকার তরুণ রক্ত। যা কোর্টে ঢেকে দেবে তাঁদের খামতি।

মহেশ জুটি বাধলেন ভারতের আরেক ডাবলস খেলোয়াড় রোহন বোপান্নার সঙ্গে। ২০১২ মরসুমের শুরু থেকেই তাঁরা পেশাদার সার্কিটে এলেন খাঁটি ভারতীয় জুটি হিসেবে। কিন্তু, দুবাই ছাড়া কোথাও দাগ কাটতে পারল না তাঁদের জুটি। মহেশ মিক্সড ডাবলসেও জুটি বাধলেন সানিয়া মির্জার সঙ্গে। ফ্রেঞ্চ ওপেনে এল বহু কাঙ্খিত সাফল্য। এর পরই অলিম্পিকের দল নির্বাচনের সময় নতুন অবতারে দেখা দিলেন মহেশ শ্রীনিবাস ভূপতি। সাফ জানিয়ে দিলেন, লিয়েন্ডারের সঙ্গে খেলবেন না অলিম্পিকে। রোহন বোপান্নাকেই তাঁর পার্টনার করতে হবে। সুর মেলালেন বোপান্না। তিনিও লিয়েন্ডারের সঙ্গে অলিম্পিকে খেলতে অস্বীকার করলেন। জমে গেল ভারতীয় টেনিস। অলিম্পিকের আগেই তুঙ্গে পৌঁছে গেল ভারতীয় টেনিসের উত্তেজনা। মহেশ-বোপান্না বনাম লিয়েন্ডার।

একের পর এক তোপ দাগতে শুরু করলেন সপার্ষদ মহেশ। গোটা দেশ যখন শক্তিশালী প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায়, তখন বেশ হতাশ করলেন লিয়েন্ডার। এত হতাশ সম্ভবত র‍্যাকেট হাতে কখনও করেননি কলকাতার বেকবাগান রো-এর প্রাক্তন বাসিন্দা। জানালেন, দেশের স্বার্থে যে কারও সঙ্গে জুটি বেধে খেলতে রাজি তিনি। এটিপি ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে লিয়েন্ডার তখন ৫ নম্বরে। নিয়ম অনুযায়ী, তিনি পছন্দের সঙ্গী নিয়ে অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে, জুটি হিসেবে অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন ভূপতি-বোপান্না। দেশের স্বার্থের কথা ভেবে জাতীয় নির্বাচকরা অভিজ্ঞতম দুই ভারতীয়কে নিয়ে দল ঘোষণা করেছিলেন। লিয়েন্ডারের সঙ্গে ১৫ নম্বরে থাকা মহেশকে জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ করে বসলেন মহেশ ও রোহন। তাঁরা বললেন লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গে অলিম্পিকের কোর্টে নামবেন না। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে লন্ডনে গেল দু'টি ডাবলস টিম। ভূপতির

মহেশ ভূপতি ও রোহন বোপান্না

দাবি মেনে, তাঁর জুটি করা হল র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪ নম্বরে থাকা বোপান্নাকে। আর লিয়েন্ডারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল র‍্যাঙ্কিংয়ে সে সময় ২০৮ নম্বরে থাকা বিষ্ণু বর্ধনকে। মহেশ অবশ্য আরও একটি দাবি জানিয়ে ছিলেন। মিক্সড ডাবলসেও তিনি খেলবেন সানিয়া মির্জার সঙ্গে। ফ্রেঞ্চ ওপেনের সাফল্যের যুক্তি দিয়ে ছিলেন নিজের দাবির স্বপক্ষে। তাঁর সেই দাবি অবশ্য মানা হয়নি।

এর মাঝেই উইম্বলডনে ব্যর্থতার মুখোমুখি হলেন মহেশ ভূপতি। ডাবলসে বোপান্না এবং মিক্সড ডাবলসে সানিয়াকে নিয়ে পা পিছলে পড়লেন ঘাসের কোর্টে। তার পর অবশ্য প্রকাশ্যে আর তেমন কিছু বলেননি। অলিম্পিকের কথাও এখন সকলে জেনে গিয়েছেন। ডাবলসে তাঁর এবং বোপান্নার জুটি বাছাই তালিকায় থেকেও দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছে। অন্যদিকে, বিষ্ণু বর্ধনকে নিয়ে লিয়েন্ডারও হেরে গিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। কিন্তু দুই জুটির শক্তি এবং তার প্রেক্ষিতে লড়াই প্রমাণ করে দিয়েছে অনেক কিছু। মিক্সড ডাবলসে লিয়েন্ডার-সানিয়া জুটি হেরেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেও লড়াই করে। বিষ্ণুকে নিয়ে অলিম্পিকের মঞ্চে লিয়েন্ডার যে লড়াই করেছেন, তা ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে থাকবে। অল ইংল্যান্ড টেনিস অ্যান্ড র‍্যাকেট ক্লাবের কোর্টে আগে কখনও খেলেননি বিষ্ণু। তাই তাঁকে উইম্বলডন চলার সময়ই লিয়েন্ডার সেখানে নিয়ে যান। যাতে তরুণ ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারেন। সেখান থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে লিয়েন্ডার তাঁর ব্যক্তিগত কোচের কাছে বিষ্ণুর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে ভুল-ত্রুটি শুধরে নিতে পারেন তিনি। আর এ সবই লিয়েন্ডার করেছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে, দেশের স্বার্থে। পেশাদার সার্কিটের লিয়েন্ডারের সঙ্গে দেশের হয়ে খেলা লিয়েন্ডারের পার্থক্য সব সময়ই এ রকম। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন ভবিষ্যতে বিষ্ণুকে নিয়েও আশা করতে পারবে দেশবাসী। সোমদেব দেববর্মন ছাড়া আরও একজন আছেন, যিনি সর্বোচ্চ পর্যায় লড়াই করতে পারেন।

৩৯ বছরের লিয়েন্ডার পেজকে ত্যাগ করে ৩৮ বছরের মহেশ ভূপতি অলিম্পিকে জুটি বাধলেন পছন্দের ৩২ বছরের রোহন বোপান্নার সঙ্গে। মরসুমের শুরু থেকে এক সঙ্গে অনুশীলন। পেশাদার সার্কিটে খেলা। তার সঙ্গে বাছাই তালিকায় জায়গা পাওয়ার সুবাদে সহজ ড্র। অলিম্পিকের অধরা পদক যেন কেবল সময়ের অপেক্ষা। একটা অলিম্পিক পদক। খেলোয়াড় জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা যে কেউই এই অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য একটা মরিয়া চেষ্টা করবেন। তিনি যদি আবার নিজের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সেরা হন, তাহলে তো শেষ চেষ্টা করবেনই। একজন খেলোয়াড়ের দিক থেকে বিষয়টা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। অলিম্পিকের আগে মহেশ ভূপতি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। সমস্ত ক্ষমতা (কোর্টের বাইরের) উজাড় করে দিয়েছিলেন। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে মুখ্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সব দেখে মনে হচ্ছিল মহেশ এবার দেশকে পদক দেবেনই। বোপান্নাকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ছিলেন কোর্টের বাইরের খেলাতেই। কারণ, রোহন বোপান্নার এনডোর্সমেন্টের দিকটি দেখে মহেশের সংস্থাই। বছর পাঁচেক আগে বোপান্না টাকার অভাবে, হতাশায় টেনিস ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে সময় সানিয়া মির্জা তাঁর পাশে দাঁড়ান। বোপান্নাকে স্পনসর জোগাড় করে দেন। সমস্যা সাময়িকভাবে মিটলেও, পাকাপাকি সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন ব্যবসায়ী মহেশ ভূপতি। সম্ভবত সেই পেশাদার ঋণ শোধ করার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারেননি বোপান্না। আর যাই হোক তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড তো আর লিয়েন্ডার বা মহেশের মতো নয়। মহেশ আশীর্বাদের হাত তুলে নিলে ফের সমস্যা তৈরি হতে পারে ভেবেই লিয়েন্ডারের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন বোপান্নাও। নিট ফল অলিম্পিকের দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায়। দেশ-বিদেশের টেনিস পণ্ডিতদের মতে, এবারের অলিম্পিকে ভারতের সেরা টেনিস জুটি হওয়া উচিত ছিল লিয়েন্ডার-বোপান্নার। নিদেন পক্ষে, মহেশের বয়স-অভিজ্ঞতার কথা ভেবে, তাঁর অধরা অলিম্পিক পদকের কথা ভেবে লি-হেশ জুটিও হতে পারত। কারণ, মহেশ-বোপান্না না মানলেও, গত ১২ মাসে দেশের সেরা ডাবলস প্লেয়ার লিয়েন্ডার পেজই। র‍্যাঙ্কিংই তার প্রমাণ। তাই, তিনি দেশের প্রথম দলে থাকবেন এটাই প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক। সেরা জুটি অলিম্পিকে খেললেই পদক আসত, তা নয়। হয়তো আর একটু ভাল, সম্মানজনক ফল হতে পারত।

সত্যি হল, মহেশ অলিম্পিক পদক পেলেন না। কিন্তু, উজ্জ্বল কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জাতীয় স্বার্থকে হত্যা করলেন। আসলে তিনি বোপান্নাকে নিয়ে একটা অলিম্পিক পদক জিতে লিয়েন্ডারের কৃতিত্বের সমান কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। লিয়েন্ডারের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের লড়াইকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে দেশের সর্বকালের সেরা টেনিস ডাবলস খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি চূড়ান্ত ব্যর্থ। নিজের সঙ্গে দেশের মানও জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কিংবদন্তি রজার ফেডেরারও অলিম্পিকে পেজ-হেশ জুটি না দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। দেশের সম্মানকে গোটা টেনিস বিশ্বের সামনে কলুষিত করেছেন। গত দু'মাসে ভারতীয় টেনিসে কী কী ঘটেছে, তার ফল কী— এ সবই আমরা অতি সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীরা মনে রাখব। মহেশ, আপনার এই স্বার্থপরতাও আমাদের মনে থাকবে। আপনার সব আত্মবিশ্বাসী ভাষণও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব। একই সঙ্গে মনে রাখব, টেনিসের সমস্ত ক্ষেত্রে লিয়েন্ডার পেজের পারফরম্যান্স আপনার থেকে ভাল। জুনিয়র পর্যায়ে লিয়েন্ডারের দু'টি গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব রয়েছে। আপনার নেই। লি এটিপি-র জুনিয়র সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর হয়েছেন। আপনি পারেননি। এই মুহূর্তে আপনার ঝুলিতে ১২টি গ্র্যান্ডস্লাম (চারটি ডাবলস, আটটি মিক্সড ডাবলস)। লিয়েন্ডারের ১৩টি (সাতটি ডাবলস, ছয়টি মিক্সড ডাবলস)। মিক্সড ডাবলসে আপনার কেরিয়ার স্লাম থাকলে, লিয়েন্ডারের আছে' পুরুষদের ডাবলসে। র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছেন দু'জনেই। পেশাদার সার্কিটের সাফল্যেও আপনার চরম শত্রু একটু হলেও এগিয়ে। কেরিয়ার প্রাইজ মানিতেও আপনি বেশ পিছিয়ে। ডেভিস কাপে লিয়েন্ডার আপনার থেকে অনেক বেশি সফল। সিঙ্গলস, ডাবলস দুই ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানই তাই বলছে। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমসেও সাফল্যের নিরিখে লিয়েন্ডার আপনার থেকে এতটুকু পিছিয়ে নেই। আর অলিম্পিক? লিয়েন্ডারের পদক আছে, সিঙ্গলসে। আপনার ডাবলসেও নেই! এর পর আগামী প্রজন্মের কোনও শিশু যদি গত দু'মাসের গল্প জানার পর আপনাকে প্রশ্ন করে, 'মহেশ তোর অলিম্পিক পদক কোথায়?' উত্তর দিতে পারবেন তো? পারবেন তো, দেশের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিতে? মহেশ সেরাকে সেরা বলে মেনে নিতে শিখুন। আপনার টেনিস দক্ষতা, যোগ্যতা নিয়ে আমাদের কোনও সংশয় নেই। আপনার অর্জিত কৃতিত্বে আমরা গর্বিত। আবার আপনারই স্বার্থপরতায়, দেশের সঙ্গে প্রতারণায় আমরা লজ্জিত। মর্মাহত। মহেশ শ্রীনিবাস ভূপতি অলিম্পিকের শেষে আপনি মহেশ শ্রী ভূপতিত। মহেশ আপনিই একবার বলেছিলেন, বাড়িতে যে ক্যাবিনেটে সব মেডেল-ট্রফি সাজিয়ে রাখেন, সেই ক্যাবিনেটের সেরা জায়গাটা খালি রেখেছেন। স্বপ্নের অলিম্পিক মেডেলটা সেখানে রাখবেন বলে। এবার কী রাখবেন সেই শূন্যস্থানে? লজ্জা, হতাশা, ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার না অনুশোচনা? বল এখন আপনার কোর্টে। লিয়েন্ডার আদ্রিয়ান পেজের ডাউন দ্য লাইন ব্যাকহ্যান্ডটা আপনাকে স্রেফ দাঁড় করিয়ে রাখল কেরিয়ারের শেষ লগ্নে! ⌘⌘

সাপ্তাহিক রাশিফল

১৯ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত

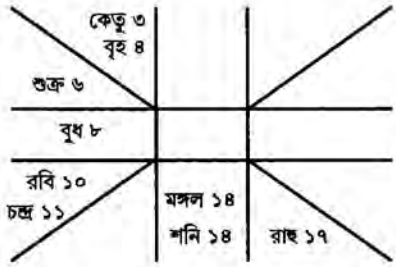

১৯ আগস্ট চন্দ্র কন্যা রাশিতে যাবে রাত্রি ১২টায়
২১ আগস্ট চন্দ্র তুলায় যাবে রাত্রি ৩।১৬ মিনিটে
২১ আগস্ট বুধ অশ্লেষায় যাবে প্রাতঃ ৬।১৫ মিনিটে
২২ আগস্ট শুক্র পুনর্বসু নক্ষত্রে যাবে দিবা ১।১১ মিনিটে
২৪ আগস্ট চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিতে যাবে প্রাতঃ ৬।১২ মিনিটে
২৪ আগস্ট মঙ্গল স্বাতী নক্ষত্রে যাবে রাত্রি ১১।২১ মিনিটে

মেষ : জাতক /জাতিকাদের খুব কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটবে সপ্তাহটা। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। তবে গোচরে শনি / মঙ্গল যোগ আঘাত লাগার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। প্রয়োজনের সময় সহযোগী মানুষদের পাশে পেয়ে যাবেন। ব্যবসায় পরিশ্রম বেশি হবে কিন্তু লাভ তেমন একটা হবে না। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে।

বৃষ : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে ছোট ছোট সমস্যা লেগেই থাকবে। যে সব জাতক/জাতিকাদের নার্ভের সমস্যা আছে তারা একটু সতর্ক থাকবেন। উপার্জন ভাগ্য শুভ। আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। কার্যক্ষেত্রে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর কাছ থেকে বা স্ত্রীর সহযোগিতায় লাভবান হতে পারেন। দাম্পত্যজীবন শুভ। কোনও সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা আসতে পারে।

মিথুন : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। উপার্জন ভাগ্য শুভ। নিজের উপস্থিত বুদ্ধি ও সহযোগী মানুষের সহযোগিতায় কাজে সাফল্য আসবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। ব্যবসায় এই সময় বিনিয়োগ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। দাম্পত্যজীবন শুভ। তবে সন্তানকে ঘিরে সমস্যা আসতে পারে।

কর্কট : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। অহেতুক উদ্বেগ মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দেবে। কোনও প্রিয়জনের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় থাকতে হবে। উপার্জন ভাগ্য সপ্তাহের প্রথমে শুভ হলেও সপ্তাহের শেষে সমস্যায় পড়তে হবে। ব্যবসাকে ঘিরে সমস্যা আসতে পারে, সতর্ক থাকুন। এই সপ্তাহে বিনিয়োগ না করাই ভাল। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়।

সিংহ : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। উপার্জন ভাগ্য শুভ নয়। অহেতুক ব্যয়ের কারণে সমস্যায় পড়তে হবে। ঋণ পর্যন্ত করতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা ভাল হলেও ব্যবসাকে ঘিরে খুব চাপের মধ্যে থাকতে হবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে বেশ উদ্বেগ, অস্থিরতা থাকবে। দাম্পত্যজীবন শুভ। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি পাবেন।

কন্যা : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রোগভোগ করছিলেন তাঁরা অনেকটাই সুস্থ থাকবেন। এ সপ্তাহে একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। এ সপ্তাহে একটু বেশি খরচ হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। কর্মক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

তুলা : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা মধ্যম। শরীর নিয়ে বড় সমস্যা না হলেও ছোট ছোট সমস্যা লেগেই থাকবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। সপ্তাহের প্রথমদিকে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। এ সপ্তাহে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। চাকরিজীবীদের নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃশ্চিক : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা তেমন ভাল যাবে না। শরীর নিয়ে নানান সমস্যা লেগেই থাকবে। ছোট ছোট শারীরিক সমস্যা হঠাৎ বড় আকার ধারণ করবে। প্রতি কাজেই বাধা আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ নয়। আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনের সময় অর্থ পেয়ে যাবেন। ব্যবসায় নানা চাপ থাকবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে গতানুগতিক চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

ধনু : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। উপার্জন ভাগ্য শুভ। এ সপ্তাহে উপার্জন বৃদ্ধির ভাল যোগাযোগ আসবে। কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা ভাল যাবে না। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় সমস্যা আসবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও কাজের পরিবেশ নিয়ে হতাশ হতে হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মকর : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে তেমন সমস্যা হবে না। এ সপ্তাহে অনেক পরিশ্রম হবে। উপার্জন ভালই হবে। জমি বা বাড়িতে কিছু অর্থ বিনিয়োগ হতে পারে। সেসব জাতক / জাতিকা নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা এই সপ্তাহে চেষ্টা করুন, লাভবান হবেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। আপনার পরিশ্রমী মানসিকতা সহকর্মীদের উৎসাহ দেবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কুম্ভ : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। কাছাকাছি ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। উপার্জন ভাগ্য তেমন শুভ নয়। পরিশ্রম যেমন হবে সেভাবে উপার্জন হবে না। সে কারণে হতাশ হতে হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। তবে ব্যবসায় চাপ থাকলেও অধিকাংশ টাকা বাজারে আটকে থাকবে। চাকরিজীবীদের গতানুগতিক চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মীন : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ নয়। শরীর নিয়ে ছোট সমস্যা হলেও বড় কোনও সমস্যা হবে না। উপার্জন ভাগ্য শুভ নয়। অহেতুক ব্যয়ের কারণে চাপের মধ্যে থাকতে হবে। ব্যবসায় বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। চাকরিজীবীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। নিজের ভুলের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়তে হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ। ⌘⌘

শ্রীকৌস্তুভ

সুস্থ শরীর মানেই আশীর্বাদ

যা পেতে আমরা আপনাকে সাহায্য করি।

Care for Life
GDDI

জি ডি মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল আধুনিক যুগের স্বাস্থ্য পরিষেবা, উন্নততম নবপ্রযুক্তি এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সহ আপনার পরিষেবায় প্রস্তুত। সুলভ মূল্যে যথাচিত যত্ন, পরিষেবা এবং আত্মবিশ্বাস সহ আপনাকে সুস্থ করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। আপনার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় প্রতিটি চিকিৎসার প্রতি আমরা সবচেয়ে বেশী যত্নশীল তাই আমরা আপনাকে প্রদান করি সম্ভাব্য সঠিক নিরাময়, আমাদের প্রতি আপনার এই আস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে আমাদের সাহায্য করে।

২৪ ঘন্টার পরিষেবা

- এ্যাডমিশন•ক্রিটিক্যাল কেয়ার (আই সি ইউ)
- রেডিওলজি ও ইমেজিং•প্যাথোলজি•অ্যামবুলেন্স

হেল্‌থ চেক-আপ স্কিমস্‌ ও প্যাকেজ

- ডায়াবেটিস মনিটরিং প্যানেল•ল্যাপ কোলি•টি ইউ আর পি
- ফেকো ও প্রিমিয়াম আইওএল প্যাকেজেস
- মাস্টার হেল্‌থ চেক-আপ
- জেনারেল ল্যাপারোস্কোপি, গাইনোকোলজি এবং ম্যাটারনিটির জন্য সার্জিক্যাল প্যাকেজ
- স্বাভাবিক প্রেগন্যান্সি চেক-আপ এবং অন্যান্য পরিষেবা

ডায়াগনোস্টিক পরিষেবা

- ৬৪-স্লাইস সিটি স্ক্যান সঙ্গে সিটি অ্যাঞ্জিও•ফুলবডি এম আর আই
- ইকোডপলার/টি এম টি•থ্রিডি ইউ এস জি•এণ্ডোস্কপি
- কোলোনস্কপি ও পি জি•ইউরো ফ্লোমেট্রি
- ই সি জি/ই ই জি/ই এম জি/এন সি ভি
- হোল্টার মনিটর•লাং ফাংশান টেস্ট•ফুট কেয়ার•ডিজিটাল এক্স-রে

বিশেষ পরিষেবা

- আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট (ও পি ডি)•ডায়াবেটিস কেয়ার•ডায়ালিসিস
- আই কেয়ার•ডেন্টাল কেয়ার•অর্থোপেডিক কেয়ার•ইউরোলজি কেয়ার
- কার্ডিয়াক কেয়ার•সকল গাইনোকোলজি এবং পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের জন্য বিশেষ আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট
- উওম্যান হেল্‌থ, ম্যাটারনিটি এবং চাইল্ড কেয়ার পরিষেবা

সকালের বহির্বিভাগ
১০০টাকা
সোম-শনি-সকাল ৮টা-দুপুর ২টা
ফলো-আপ সাতদিনের মধ্যে
জিডিডিআই-এর রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে
বিনামূল্যে

DILKHUSH MEMORIAL
WOMAN AND CHILD CARE

24 Hours HELP LINE 3987-3987

Website: www.gddihealthcare.com

139A, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013
E-mail : info@gddihealthcare.com
Website : www.gddihealthcare.com

G D HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
A MULTI-SPECIALITY HEALTHCARE DESTINATION

পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি সংস্থা

KOLKATA WEST

An exclusive gated community with villas
Your own landed homes with a private green
25 minutes drive from Park Street
30 minutes drive from Airport via Belgharia Expressway
Areas ranging from 1069 to 4500 sqft.
High-end finishes

Limited edition homes waiting for the select few

A few ready to move in villas available

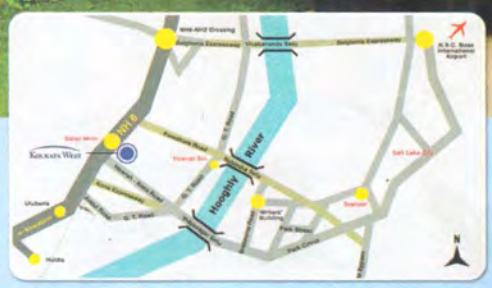

vichitra
THE RETAIL ARCADE

MEDICAL CENTRE to be run by Sanjiban Hospitals

opening shortly

Launching soon
Lavanya
The Apartments

A project by
USE Infra

Project supported by
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Ph: 033 3002 6000 Email: sales@kwic.co.in
or Call: Aveek: **+91 98367 00021**, Soumitra: **+ 91 98742 88088**, Soumen: **+ 91 90517 02227**

Kolkata West International City, Unit No. A/9/20, Salap Junction, Howrah Amta Road and Bombay Road Crossing, NH6, Howrah - 711 403